গোলাপদা

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

গোলাপদা থাকতেন কোলকাতার তাহেরপুরে। একমাত্র কন্যা শান্তার সাথে। শান্তা বিবাহিতা। সে তার স্বামী সন্তান নিয়ে মা-বাবাকে দেখাশুনা করতো বাবার বাড়িতে থেকেই। স্বামী মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত। গোলাপদার আরও দুই ছেলে তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে অন্যত্র থাকে। মা-বাবার খোঁজ-খবরও নিতো না তারা। এক ছেলে দেশেই আছে। অন্যজন শিপে কর্মব্যস্ত অবস্থায় দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ায়। মা-বাবার কাছে তাদের দাবি, যেন তারা বাড়ি-জমি সন্তানদের নামে লিখে দেন। প্রায় দুই বছর আগে গোলাপদার স্ত্রী গত হন। দীর্ঘ দিন তিনি শয্যাশায়িনী হয়ে অর্থের অভাবে এক রকম অনিয়মিত চিকিৎসা পেয়েই মারা গেলেন। ছেলেদের অবহেলা মা-বাবার জন্য ছিল চরম কষ্টকর প্রাপ্তি। কোনমতে কায়ক্লেশেই দিনাতিপাত করতে হয়েছে দাদা-বউদিকে।

গোলাপদা তার দুই পিসির কোলেপিঠে আদর-যত্নে বড় হয়েছেন। পিসিমায়েরা অবিবাহিত ছিলেন ব'লে, মাতৃহারা ভাইপোকে আঁকড়ে, ওখানেই তাদের জীবন অতিবাহিত করে গিয়েছেন। সম্পদ বলতে যা করেছিলেন, সমস্তই স্নেহের ভাইপোকে দান ক'রে গেছেন তারা। সম্পত্তি বলতে, তাহেরপুরের করোগেটেড টিনের চালা সম্বলিত ইটের দেয়ালের একতলা বাড়ি ও পার্শ্ববর্তী কয়েকে কাঠা জমি।

গোলাপদা মাতৃহারা হন তার শিশুকালেই। তার মা আমার মায়ের ছোট বোন। বিয়ে হয়েছিলেন আমাদের পার্শ্ববর্তী মিশনেই। গোলাপদা মাতৃহারা হবার আগেই তার দুই পিসিমা কোলকাতায় থিতু হয়েছিলেন। পরে তার ঠাকুরমাও মেয়েদের কাছে চলে যান।

গোলাপদার বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করে, নতুন ক'রে ঘর-সংসার গুছিয়ে নিলেন। একসময় ঠাকুরমা ও পিসিমায়েরা তাকে কোলকাতায় নিয়ে যান। কোলকাতায় ঠাকুরমায়ের এবং দুই পিসিমায়ের সেবাযত্নে ও স্নেহভালোবাসায় পরিপুষ্ট হয়ে বড় হতে থাকলেন গোলাপদা। সেখানেই কাটে তার শৈশব, বাল্যকাল, কৈশোরকাল এবং একসময় তিনি যৌবনে পা রাখেন। পড়াশুনা যতটুকু করেছেন তা সম্বল ক'রে তাকেও কোলকাতার মত মহানগরীতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। তার বিয়ের আগেই স্নেহময়ী ঠাকুরমা গোলাপদাকে ছেড়ে পরপাড়ে পাড়ি জমান। ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়সে পিসিমা দু'জন; গোলাপদাকে বিয়ে করান কোলকাতাতেই। তার সংসারে আসে বড় দুই ছেলে এবং ছোট এক মেয়ে।

উনিশ শ' ছিয়ানব্বইয়ে আমি কোলকাতায় গেলে, দাদার সাথে ফোনে কথা বলি। সেবার তার সাথে দেখা করার সুযোগ আমার হয়নি। আমরা গিয়ে উঠেছিলাম আমার স্ত্রীর পিসিমার বাড়ি, দমদমের মাটকলে। যেহেতু তার বাড়িও দূরে তাই ছুটি ম্যানেজ ক'রে আমাদের পরিবারের মোট পাঁচ জন সদস্যকে তার বাড়িতে নেয়ার সুযোগও তার হয়ে ওঠেনি। তিনি বলেছিলেন ভাইরে, তোদের দেখলে তর বউদি ও সন্তানরা খুবই খুশী হতো। আমি বলেছিলাম, এবার নয় দাদা। আগামীতে একসময় হবে নিশ্চয়। তো, আগামির সেই একসময় ও সে সুযোগ আমাদের হয়নি। অবশ্য পরে আমার বড়বোন, তার চিকিৎসার জন্য কোলকাতা এসে তাহিরপুরে গোলাপদার বাড়িতে গিয়েছিলেন।

আমরা দুই হাজার এক খ্রিস্টাব্দে আরেকবার গিয়েছিলাম ভারতে। সেবার বেড়াতে নয়, আমার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য। কোলকাতার কোন ক্লিনিকে বা হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ না পেয়ে, সে-বার যাত্রা করেছিলাম ভেলোরের খ্রিস্টিয়ান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উদ্দেশে। সেখানে যাত্রার পূর্বে মার্কুইস এভিনিউর গেস্ট হাউজে এসে আমাদের সাথে দেখা করেছিলেন গোলাপদা। তিনি কোলকাতা শহরে ভাড়াকৃত তার খুপড়ি ঘরে আমাকে নিয়ে যান। আমি যাই গোলাপদার আবাসে। সেখানে থেকেই নিত্যদিন তিনি তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। দশ বাই বার হাতের একটি রুমে রান্নার বাসন তৈজস, জামাকাপড়ে আকীর্ণ গুমট স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে থাকতেন তিনি। শোয়ার জন্য একটা খাট তো নয়ই, চৌকিও নেই। এমনই পরিসরে তা পাতার সুযোগ এবং স্পেসও নেই। বাধ্য হয়ে মেঝেতেই মাদুর পেতে ঘুমান তিনি। এ দৃশ্য দেখে খুবই কষ্ট পেলাম। বললাম, 'দাদা। এত কষ্ট কর তুমি? দেশে থাকলে তো তোমাকে এত কষ্ট করতে হতো না।' তিনি বললেন, 'এখন এটাই তো আমার নিজের দেশ। কী আর করবো ভাই। সবই ভাগ্যের লিখন। তবে এটা নিশ্চিত, বাংলাদেশে থাকলে আমার এমন অবস্থা হতো না।' আমি বলেছিলাম, 'তা হলে এখানকার সব চুকিয়ে দিয়ে তোমার মাতৃভূমিতেই চলে এসো দাদা।' একবুক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বলেছিলেন, 'নারে ভাই! এখন তা কি আর হবে? চাইলেই সব হয় না।' আমার প্রশ্ন ছিল, 'কেন হয় না দাদা?' দাদা বলেছিলেন, 'পিসিমায়েরা বলেছিলেন, তাদের সম্পত্তি আমি যেন হাতছাড়া না করি। তা ছাড়া আমি বাংলাদেশে ফিরে যাই, তা তারা চাননি।' কোলকাতায় যে বাড়িটাতে তিনি থাকতেন, বাইরের দেয়ালের ইট খসে পড়ছে। শ্যাওলা ও মাকড়শার জালে পরিপূর্ণ সেই পুরনো আমলের একটি দালানবাড়ি।

তা দালানবাড়ি বা বিল্ডিং বলতে দেখলাম, এখানে হাতল বিহীন সিঁড়ি বেয়ে উপরে হেঁটে উঠতে হয়। জরাজীর্ণ দরজা জানালা। বাইরের ঝুল বারান্দার দশাও শোচনীয়। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, আমাদের পুরনো ঢাকার কিছু চিত্র। মনে হলো, তবুও আমাদের অবস্থা অনেক ভালো এর চেয়ে। এ তো রীতিমত কয়েদিখানা! এখানেও মানুষ থাকে, জীবনের অবশ্যম্ভাবী সমূহ ঝুঁকি নিয়ে! নির্মম! ভূমিকম্প দূরে থাক। যে কোন সময়, এমনিতেই আলগা হয়ে যাওয়া ইট খসে পড়তে পারে যে কারোর মাথার উপর। নড়বড়ে দেয়াল ধ্বসে পড়তেই পারে, সবকিছু নিয়ে বাসিন্দাদের উপর। আর বাইরের নালা নর্দমা তো, ময়লা আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। রাস্তার উপর উপচে পড়ছে রাজ্যের রাবিশ!

তো আধুনিক সল্টলেক সিটির পাশাপাশি, স্বপ্নের নগরী কোলকাতার এ আরেক আবহের চিত্র। ভাবি, এও কোলকাতা! বাংলা শিল্প-সাহিত্যের তাবৎ রথী মহারথীদের স্বপ্নের কোলকাতার এও আরেক রূপ! হ্যাঁ। আমাদের বেলায়ও ঢাকার চিত্র দেখে, হয় তো কোলকাতার মানুষ ভাবতে পারেন, বলতে পারেন, রাস্তায় ময়লা আবর্জনা, ডিশের তারে ন্যুজ ইলেক্ট্রিসিটির খাম্বাগুলো! দোকানপাট, ক্রেতা-বিক্রেতায় ঠাসা ফুটপাথ, জনাকীর্ণ বস্তি এলাকা, অপরিচ্ছন্ন পথঘাট, মাত্রাতিরিক্ত ধূলি ধোঁয়ায়, রিকশা বাস ঠ্যালা আর মানুষের কিলবিল জমাটে ত্রাহি অবস্থা! সেখানে হর্নের ও যাবতীয় শব্দের অত্যাচারে কানপাতা দায়। এও এক তিলোত্তমা শহর বাংলাদেশের রাজধানী নগরী ঢাকা। হ্যাঁ ভালোর পাশাপাশি মন্দের সহাবস্থানও বটে। এ যেন, পূর্ণিমার চাঁদের গায়ে আবছা কালো ছায়ার মত। তেমনি কোলকাতা। তেমনি ঢাকাও। তো গোলাপদা সে সময় বেশি সময় দেননি।

সেদিন তিনি কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তারপরেও গিয়েছিলাম, তার সাবেকি আমলের সেই আস্তানায়। তো আমরা ভেলোরে চিকিৎসার জন্য গেলেও, সেখানে আমার স্ত্রীর জন্য ডাক্তার বা সার্জন ছিলেন না। দীর্ঘ একমাস এই পরীক্ষা এবং এমআরআই করিয়ে পরিশেষে ডাক্তার বলেছিলেন, কোন অপারেশন নয়। উচ্চমূল্যের ইনজেকশন নিতে হবে। তো অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে এই ইঞ্জেকশন পুশ করাতে হবে। আমার স্ত্রীর ইংল্যান্ড প্রবাসী মামা ডা: নিকোলাস ছিলেন তখন ঢাকায়। ফোনে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'ইঞ্জেকশন নিয়ো না। এই ইঞ্জেকশন স্মৃতির স্থায়ী সমস্যার সমাধান নয়। এখন তার দরকার, অপারেশন। তার মেরুদণ্ডের ডিস্ক

রিমোভ করাতে হবে।' কোন উপায় না দেখে, আমরা আবার ফিরতি যাত্রা করলাম কোলকাতার উদ্দেশে। ফোনে গোলাপদার সাথে কথা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'কোলকাতায়ও এপেলো হাসপাতাল আছে। তোমরা ওখানে গিয়ে দেখতে পারো।' মার্কুইস এভিনিউর গেস্ট হাউজের মালিক আমাদের, গড়িয়া হাটে অবস্থিত এপেলোর ঠিকানা দিলেন। হাসপাতালের পাশেই একটি বাসা ভাড়া নিয়ে, আমরা ডাক্তার দেখিয়েছি। এপেলোতে অপারেশন থিয়েটারে সুযোগ না পাওয়ার কারণে, সেখানকার অর্থোপেডিক ডাঃ পাহাড়ির (দেখতেও পাহাড়ের মত উঁচু) তত্ত্বাবধানে গোলপার্কের একটি নার্সিংহোমে ব্যবস্থা হলো। অপারেশন করলেন, আমেরিকায় কুড়ি বছরের সার্জিকালের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, বৃদ্ধ ডাক্তার শঙ্করলাল ব্যানার্জি। আমরা কোলকাতায় গিয়েছিলাম, শ্যামলী পরিবহনের বাসে। ডাক্তার শঙ্করলাল পরামর্শ দিলেন, অপারেশনের রোগীকে বাসে নয়, বিমানে দেশে নিতে হবে। পরে তাই হলো। কোলকাতার এ অফিস ও অফিসে ছোটাছুটি ক'রে আমাদের দু'জনের জন্য বিমানের ব্যবস্থা হলো। আমাদের সাথী শ্যালক বিপ্লব, শ্যামলীর তিন আসনে শুয়ে ব'সে ঢাকায় ফিরলো। এত কিছুর পর, দেশে ফেরার সময় সেবার গোলাপদার সাথে দেখা আর করতে পারিনি। শুধু ফোনেই কথা হয়েছে।

দীর্ঘ প্রবাস জীবনে, গোলাপদার সাথে অনেকদিন যোগাযোগ করতে পারিনি। প্রবাসে নানাবিধ ব্যস্ততার অজুহাতে তার সাথে কথা হয়নি। আমেরিকায় এসেও দীর্ঘদিন কথা হয়নি। তবে, বিগত তিন বছরে ফোনে কথা হয়েছে বেশ কয়েকবার। দাদা তার সংসারের বিষয় নানা বিষয়ে কথা বলতেন। তিনি এখন অবসরে আছেন। অর্থাৎ বউদির অসুস্থতার জন্য দাদাকেই সেবাযত্ন করতে হয় সর্বক্ষণ। তাই সংসারের অসচ্ছলতা আবার তাকে ঘিরে ধরেছে। ছেলেরা তেমন খোঁজখবর নিচ্ছে না। মেয়েটার বিয়ে দিয়েছেন। সে আছে তার স্বামী-সন্তান-সংসার নিয়ে। বউদির অবস্থা কোনমতেই ভালো হচ্ছিল না। ফোনে কয়েকবার বউদির সাথেও কথা হয়েছে আমার। যদিও তাকে বা তাদের সন্তানদের দেখিনি কখনো। এক সময় দেশ থেকে আমার বড় বোন জানালেন, 'গোলাপদার স্ত্রী মারা গেছেন। সংবাদ শুনেই, সুবিধামত সময়ে ফোন করলাম দাদাকে। শুধু আক্ষেপ ও মনোবেদনাই প্রকাশ করলেন তিনি। উপযুক্ত সেবাযত্ন এবং ঔষধ-পথ্যের অভাবেই তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। দাদার শরীরটাও তেমন ভালো নেই।' ফোনে দাদার সাথে কথা হলোও। তার কথা, 'ভাগ্যে যা লেখা রয়েছে, তা তো ঘটবেই! তোর বউদি ম'রে, বেঁচে গিয়েছে! জীবনযন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেয়েছে। এখন আমার পালা!' আমি বলেছিলাম, 'এমন বলো না দাদা! বউদির ক্যান্সার ছিল। তুমি তো ভালো আছো। ঈশ্বর তোমাকে সুস্থ রেখেছেন। তুমি শতবর্ষী হও এই প্রার্থনা করি।' তার কথা, 'আমি ভালো নেইরে ভাই! বেঁচে থাকার ইচ্ছে, আমার আর নেই।'

গত ছয়মাস আগে ফোনে দাদাকে বললাম, 'মনে যদি কিছু না কর। তোমার জন্য কিছু টাকা পাঠাতে চাই।' শুনে দাদা বললেন, 'নারে ভাই। এ কাজ করিসনে। এ সময় আমার টাকার দরকার নেই।' আমি বললাম, 'তোমার তো কাজ নেই। আর ছেলেরা তো দূরে থাকে। ফলটল খাওয়ার জন্য কিছু টাকা পাঠাই দাদা।' তিনি বললেন, 'ধন্যবাদ ভাই। আমার প্রয়োজন হলে, নিজেই বলবো।'

আমিও নাছোড়বান্দা। বললাম, 'তোমার ব্যাঙ্ক একাউন্ট আমাকে দাও। বেশি নয়, অল্প কিছু পাঠাবো। এই কোভিড পরবর্তী সময় এবং চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণেই বিশ্বের সব দেশেই জিনিসপত্রের দাম অত্যধিক বেড়ে গেছে। জানি, তোমারও কষ্ট হচ্ছে। 'তো, শেষমেশ দাদা রাজি হয়ে তার ব্যাঙ্ক একাউন্ট পাঠালেন। কিছু টাকা পাঠালাম তার নামে। পেয়ে দাদা ধন্যবাদ জানিয়ে সেই একই কথা আবার বললেন, 'ভাইরে আমার তো টাকার দরকার নেই। টাকার কথা শুনে তোর ভাইস্তি শান্তা তো রাগ করলো। সে বললো, বাবা নিশ্চয় তুমি কাকাকে টাকার কথা বলেছ! তুমি, এটা করলে কেন?' আমি বললাম, 'দাদা। তুমি টাকার অভাবে বউদির সুচিকিৎসা করতে পারোনি। তবে, তোমার উচিত ছিল, তাহেরপুরের তোমার সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রি করে বউদির ও তোমার চিকিৎসা করা।' তিনি বললেন, 'ভাইরে জমির যতটুকু আছে তা হাতছাড়া করতে চাইনি। আমার দুই পিসিমাদের কষ্টের ফল এই জমি ও বাড়িটা। তা থেকে আমি বিক্রি করি কী ভাবে? আমি এই জমি, বাড়ি আমাদের তিন সন্তানের নামেই লিখে রেখে যেতে চাই।'

নিজের ব্যস্ততা এবং আলস্যের কারণে, এরমধ্যে গোলাপদার সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি। দেশ থেকে ম্যাসেঞ্জারে বড়বোন জানালেন, 'গতকাল কোলকাতায় গোলাপদা মারা গেছেন। তার মেয়ে ফোনে জানিয়েছে!' আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। এ কী দুঃসংবাদ! গোলাপদা নেই! অথচ, গত সপ্তায় আমার ইমোতে তিনি ম্যাসেজ দিয়েছিলেন, 'ইন্ডিয়া থেকে আমি দাদা!' আমার মোবাইল থেকে কোনক্রমেই তাকে সংযোগে আনতে পারিনি। এ দেশের লাইকা মোবাইলে তার সাথে কথা বলা হতো। তার ম্যাসেঞ্জার ছিল না। লাইকা মোবাইল থাকতো স্মৃতির কাছে। এদেশ ও ভারতের সাথে দিনরাতের ব্যবধানের কারণে, তার সাথে আর কথা বলা হয়নি। লাইকা মোবাইল থেকে গোলাপদার নাম্বারে কল দিলাম। ধরেছে শান্তা। 'হ্যাঁ কাকাবাবু। বাবা মারা গেছেন!'

-'কবর হয়েছে কি?'

-'না কাকাবাবু। এক ভাই আছে দেশের বাইরে। ছোটজন কাল বাড়ি আসলেই কবর হবে। এই যে, বারান্দায় বাবার লাশ আছে।'

আমার বুকের পাঁজর যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে! হায় দাদা! সত্যি তুমি চ'লে গেলে! কয়েকদিন পর শান্তার সাথে আবার কথা হল। সে জানাল, বাবার মৃত্যুর তিন দিন পর নিরামিষ ভেঙ্গেছে তারা। গোলাপদার মৃত্যুর প্রায় মাস তিন পর কাল, দেশ থেকে আমার বড়বোন জানিয়েছেন, গোলাপদার মেয়ে শান্তার সাথে তার কথা হয়েছে। সে তার সন্তানদের নিয়ে, বাবার বাড়ি ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে উঠে যাচ্ছে। ভাইয়েরা এখন চাইছে না, সে ওই বাড়িতে থাকুক। সে আরও বলেছে, বাবার কবরটা ইতোমধ্যেই ঝোপ-ঝাড়ের আবডালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে! পরিষ্কার করারও কেউ নেই! তার কাছে শান্তার পাঠানো, মৃত গোলাপদার কয়েকটা ছবি আমার ম্যাসেঞ্জারে পাঠালেন তিনি। ছবিগুলো দেখে, শুধু এ কথাই বলেছি, 'এ ভাবে তোমাকে দেখবো, তা কখনও ভাবিনি দাদা!' ছবিগুলো এখনও মাঝে মাঝে দেখি, আর আফসোস করি। আর দেখা হল না দাদা!

আলাপ প্রসঙ্গে গোলাপদা একবার আমাকে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য মনটা কেবল ছটফট করে। ইচ্ছে করে, ছুটে যাই এখানে সবকিছু ফেলে। শত হলেও ও দেশটা তো আমার মাতৃভূমি! আমার মনে হয়, বাংলাদেশে থাকলেই আমি আরও অনেক বেশি ভালো থাকতাম। কিন্তু, এখন আমার সেই পথ নেই! আমার ঠাকুরমা ও দু' পিসিমায়েরা মিলে আমার পায়ে শিকল পড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন। পিসিদের কাছে আমি কথা দিয়েছিলাম, তাদের এ বাড়ি, জমি কখনও হাতছাড়া করবো না। আর, দেশেও ফিরে যাবো না। তাদের বিদেহী আত্মাকে কষ্ট দিতে চাই না ভাই! তাই, এক রকম মাটি কামড়েই পড়ে আছি এখানে। থাকবোও আমৃত্যু তাই ক'রে।'

আমি বলেছিলাম, 'বাংলাদেশে তো তোমার ওয়ারিশ রয়েছে। তোমার মায়ের বাড়ি এবং বাবার বাড়ি থেকে তো ভালোই অংশ পাও।'

আমি জানি, আমাদের মায়েদের বাপের বাড়ি থেকে তার মায়ের অংশ বলতে, গোলাপদা তেমন কিছুই পান নি। আমরাও পাইনি। আমাদের ওয়ারিশ বলতে, ওখানে এখন কিছুই নেই! সবই বেহাত হয়ে গিয়েছে! সেদিন গোলাপদার বুক চিঁড়ে লম্বা শ্বাস বেরিয়ে এসেছিল। 'ও কথা বলে কী হবে ভাই!' আমিও জানতাম, কিছুই পান নি। পাবেনও না। আদতে, কিছুই হবে না। পরিশেষে, গোলাপদা চলেই গেছেন সবকিছু ছেড়ে। পিসিমায়েদের সম্পত্তি রক্ষা করবেন বলে, তাদের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন বলেই, নিজের মাতৃভূমিতে একেবারে চলে আসতে পারেননি তিনি। কোলকাতাকে, ভারতকে তিনি নিজের স্থায়ী ঠিকানা এবং দেশ হিসেবেও আত্মস্থ করতে পারেননি। শুধু, মাতৃভূমি বাংলাদেশের জন্য নীরবে চোখের জল ফেলেছেন। এখন, পরমদেশে ভালো থাকো দাদা!

স্বপ্নের দেশে বিলাইয়ের মা

শিউলী রোজলিন পালমা

ফ্রেশ হয়ে ডিনার সেরে বিছানায় যেতে প্রায় রাত একটা বেজে গেল স্নিগ্ধ ও তিনার। ৩০ ঘন্টা জার্নির মারাত্মক ক্লান্তির কারণে নিমিষেই ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। গভীর ঘুমে তলিয়ে থাকা অবস্থায় তিনার আর্তচিৎকারে বিছানায় লাফিয়ে উঠে স্নিগ্ধ। আর তখনই তিনার মাথার কাছ থেকে জ্বলজ্বল করা চোখদুটো নিয়ে পালিয়ে গেল কালো বিড়ালটা। তিনার ভয়ার্ত চিৎকার শুনে পাশের রুম থেকে বেড়িয়ে আসে সাবিদ।

- কি হল তিনা?
- উত্তরে স্নিগ্ধ বলে, 'একটা কালো বিড়াল মনে হলো পালিয়ে গেল।'
- আহারে, এ তো আমাদের লোলা। ভয়ের কিছু নেই আবার ঘুমাও। ঘড়ির দিকে একনজর তাকিয়ে সাবিদ বলল, 'আরো চার ঘন্টা ঘুমাতে পারবে, সকাল নয়টায় উঠে ব্রেকফাস্ট করে বের হবো। ইউনিভার্সিটির অফিস খুলবে সকাল দশটায়। অফিস থেকে তোমাদের এপার্টমেন্টের চাবি নিয়ে সোজা চলে যাব 'ওয়ালমার্ট', সেখান থেকে তোমাদের নিতান্ত জরুরি জিনিসপাতি কিনে, পৌঁছে দেব তোমাদের নিজের বাসায়।

গতকাল মধ্যরাতে স্নিগ্ধ ও তিনা ঢাকা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরী অঙ্গরাজ্যের স্প্রিংফিল্ড সিটিতে পৌঁছেছে। ওরা দু'জনেই এখানকার মিসৌরী স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়বে। দু'জনই সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, একজন মাস্টার্স ও অন্যজন পিএইচডি প্রোগ্রামে এসেছে। দেশে থাকা অবস্থায়ই ইউনিভার্সিটি ভিলেজে বাসা ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু মধ্যরাতে তো আর কেউ বাসার চাবি নিয়ে বসে থাকবে না তাই একরাত হোটেলে কাটাবে বলে যখন সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল তখনই বুয়েটের সিনিয়র ভাই সাবিদ আকবর বলল, 'হোটেলে উঠার দরকার নেই, আমার বাসায়ই আসো, কারণ এই নতুন জায়গায় এডজাস্ট হওয়ার প্রাথমিক ধাক্কা তো আমরাই সামলাবো।'

সাবিদ ভাই এই ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি শেষ করে সবেমাত্র চাকুরী নিয়েছে। সাবিদ ভাইয়ের বাসায় উঠে ভালই হলো ফ্রেশ ভাত, রুই মাছের দোপেঁয়াজা, মুরগীর মাংস কষা ও বেগুন ভাজা পাওয়া গেল। হোটেলে উঠলে চিন্তা করতে হতো কি খাবার অর্ডার করবে, খাওয়া যাবে কি না। তবে স্নিগ্ধ তিনার জন্য আয়োজন করতে সাবিদ ভাইয়ের বউ মিতি ভাবীর ভীষণ কষ্ট হয়েছে। সাবিদ ভাই যখন টেবিলে খাবার সাজাচ্ছিল তখন মিতি ভাবী বলছিল, 'সাবিদ তুমি দেখেশুনে খাওয়াও আমি আর পারছি না, আমার ব্যাকসাইড, সোলডার একদম স্টীভ হয়ে গেছে, রাতে কিন্তু আমার সোলডার টিপে দিতে হবে, অবশ্য কিছুক্ষণ আগে শাওয়ার নেয়ার পর এখন বেটার ফিল করছি।'

- একটু বিব্রত স্নিগ্ধ বলল, এত রাতে শাওয়ার নিলেন ভাবী?
- ওরে ভাই, সকালে ব্রেকফাস্টের পরই রান্না শুরু করেছি, এইতো ঘন্টাখানেক আগেই

ছবি: ইন্টারনেট

কাজ শেষ হলো। আসলে আমি রান্না খুব একটা করি না, ব্যচেলরদের মত কিনে টিনে খাই, সাবিদ মাঝে মাঝে রান্না করে। রান্না আমার কাছে খুবই বিরক্তিকর, আসলে কাজগুলি আমি তাড়াতাড়ি করতে পারি না, অনেক সময় লাগে। তবে একবার যদি রান্না করে ফেলি তবে খুবই টেস্টি হয়। সাবিদ খেয়ে প্রশংসা করতে করতে কান ঝালাপালা করে ফেলে।

- উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে স্নিগ্ধ বলে, 'একদম সঠিক বলেছেন ভাবী, আপনার রান্না আসলেই অসাধারণ, বিশেষ করে আজকের বেগুন ভাজাটা, এত মজার বেগুনভাজা আগে কখনও খেয়েছি কিনা মনে পড়ছে না।"

খাওয়া শেষে মিতি ভাবীর বেসিনে জমে থাকা সব প্লেট, গ্লাস, বাটি, চামচ ধুতে শুরু করে তিনা পাছে এগুলো ধুতে গিয়ে ভাবীর কাঁধের ব্যাথা সহ্যের বাইরে চলে যায়!

পরদিন এপার্টমেন্টের চাবি হাতে পেয়ে মাথা থেকে যেন ভার নেমে গেল স্নিগ্ধ ও তিনার। দেশ থেকে আনা চারটি লাগেজ ও ওয়ালমার্ট থেকে কেনা দুটো বালিশ, কিছু ক্রোকারিজ ও কিছু বাজার নিয়ে উঠে পড়ে নিজের বাসায়। উঃ! কী শান্তি! ফ্লোরে ঘুমাই আর পাউরুটি কলা খাই তবুও শান্তি, নিজের বাসায় তো আছি। ইউনিভার্সিটি ভিলেজে বাসা হওয়ায় একদিকে আরাম যে, দুজনের ডিপার্টমেন্ট, হেলথ্ সেন্টার, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট কাউন্সিল সেন্টার সবই কাছে। হেঁটে সর্বত্রই যাওয়া যায়। আর এত সুন্দর দেশ, এত সুন্দর প্রকৃতি, এত পরিচ্ছন্ন নির্মল বায়ু মনটা সারাক্ষণই পুলকিত হয়ে থাকে। এমন সুন্দরের মাঝে টিকে থাকতে সব কিছু করতেই মন চায়।

এ সুন্দরের মাঝেও এডমিশন প্রসেস শেষ করতে করতেই অধৈর্য হয়ে তিনা বলে, 'আর ভাল্লাগে না, এখানে আসার আগেও একগাদা কষ্ট করেছি, GRE দাও, TOEFL দাও, প্রফেসরকে ই-মেইল কর, ইন্টারভিউ ফেস কর। আর এখানে এসে শুরু হয়েছে ব্যাংক একাউন্ট কর, হেলথ্ টেস্ট দাও, হেলথ্ ইনস্যুরেন্সের জন্য এ্যাপ্লাই কর, সোস্যাল সিকিউরিটি কার্ড বের কর আরো কত কী।

- আমরা কী সারাজীবন শুধু কষ্টই করব?
- কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে, স্নিগ্ধর আবেগহীন উত্তর।
- কষ্টগুলো কষ্ট থাকতো না যদি না একটা গাড়ি থাকতো, ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট না হয় কাছে কিন্তু ব্যাংক দূরে, বাজার ঘাট দূরে। হেঁটে চলা-ফেরার কোন উপায়ই নেই। গাড়ীর জন্য কতদিন অন্যকে অনুরোধ করা যাবে?

ছোট্ট শহর স্প্রিংফিল্ডে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট তেমন একটা নেই। বাংলাদেশের রিক্সা, সিএনজি ভীষণ মিস করে তিনা। বিরক্ত হয়ে বলে, 'এত সুন্দর দেশ, এতসব ঝকঝকা প্রশস্থ রাস্তা, একদিক দিয়ে একটু রিক্সার লেন থাকলে কী ক্ষতি হতো! আমাদের মত নবাগতদের কত সুবিধা হতো!' স্নিগ্ধ তিনার মত আরও তিনজন এবছর এ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রীতম মাস্টার্সে এবং হৃদিতা ও ইথান আন্ডারগ্রেড প্রোগ্রামে।

চলা-ফেরা নিয়ে তিনা যতটা আশঙ্কায় ছিল তার আসলে কোন প্রয়োজন ছিল না।

কারণ ভর্তির চার মাসের মাথায় নিজেদের গাড়ি কেনার আগ পর্যন্ত এ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত ১৮জন বাংলাদেশের সোনার ছেলে-মেয়ে তাদের প্রতিটা প্রয়োজনে তাদের পাশে থেকেছে। ব্যাংকে যাওয়ার প্রয়োজন? রিয়াজ ভাই ফ্রি আছে, গাড়ী নিয়ে চলে এসেছে, কাজ সেরে বাসায় দিয়ে গেছে। পরদিন গির্জায় যাবে, রিয়াজ ভাই যোগাযোগ করে বলেছে সুদীপ ফ্রি আছে, সুদীপ তোমাদের গির্জায় নিয়ে যাবে। ঘরের বাজার-ঘাট নিয়েও ভাবতে হল না, কয়েকদিনের মধ্যেই জেনে গেল দেশী সবজি পাওয়া যাবে 'ক্রোগার্সে', হালাল মাংস, দেশী মাছ ও দেশী মসলা পাওয়া যাবে 'ইন্দুপাকে' আর সব জিনিসপাতির পসরা সাজিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে 'ওয়ালমার্ট'।

এক উইকেন্ডে স্নিগ্ধ তিনা যখন ভাবছিল বাজারে যাওয়া প্রয়োজন তখনই বেলী ভাবী ফোন দিয়ে বলে, 'তিনা, 'ইন্দুপাক' যাচ্ছি, যদি বাজারের প্রয়োজন থাকে আমাদের সাথে যেতে পার।' গাড়ীতে যেতে বেলী ভাবী বলে, 'তোমরা নাকি এখানে এসে প্রথম রাত সাবিদদের বাসায় ছিলা?'

- হ্যাঁ
- কিভাবে পারলা?
- কেন ভাবী?
- কতমাস ঘরে ভ্যাইকুম হয়নি কে জানে, বেসিনে থাকে একগাদা হাঁড়ি বাসন, সারা ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে বই খাতা, কাপড় চোপড়। ওই হজপজের মধ্যে একঘন্টা বসে চা খাওয়া যায় কিন্তু রাত কাটানো! ও! অসম্ভব কাজ সম্ভব করেছো তোমরা।
- আমতা আমতা করে তিনা বলে, 'আসলে আমরা তো কিছু জানতাম না।'
- থাক তোমরা আবার মিতিকে ঘর গুছানোর ব্যাপারে কোন জ্ঞান দিতে যেও না যেন।
- বলেন কী ভাবী কখনই না।
- কথাটা বললাম এজন্য যে তোমাদের ভিলেজের ইভিতা আপু একদিন মিতিকে বলেছিলেন, 'মিতি তুমি তো ঘরেই থাক, সুতরাং ঘরটাকে তো একটু গুছিয়ে রাখতে পার। তখন মিতি রেগে গিয়ে বলেছিল, 'আপনার মত একটা বড়লোক মামা থাকলে আমিও ঘর গুছিয়ে রাখতাম।'

ইভিতাসহ সেখানে উপস্থিত পাঁচ/ছয় জন ইঞ্জিনিয়ার কিছুতেই হিসাব মিলাতে পারলনা যে বড়লোক মামার সাথে ঘর গুছানোর সম্পর্ক কী। তবে ইভিতার মামা নিউইয়র্ক থেকে এসে ৫০০০ ডলার দিয়ে ইভিতাকে একটি গাড়ী কিনে দিয়ে গিয়েছিল।

এ পরবাসে গাড়ী দিয়ে চলাফেরায় যে যত সাহায্যই করুক না কেন যেখানে কারোরই হেল্প নেয়া যায় না, সেটা হল পড়াশুনা আর একান্ত নিজের কাজগুলো। একজন গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে সপ্তাহে ২০ ঘন্টা ডিপার্টমেন্টের অফিসে অফিস করা, ক্লাশ করা, অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি, প্রেজেন্টেশন তৈরি, ল্যাবে থাকা, ঘরের রান্না, ক্লিনিং সব মিলিয়ে যখন একদম হাঁসফাঁস অবস্থা হয়ে যায় তখনই এই পরবাসে বেঁচে থাকার অক্সিজেন যোগাতে আয়োজন হয় কোন না কোন প্রোগ্রাম। এ উইকেন্ডে যদি থাকে কারো বার্থডে, তো ওই উইকেন্ডে থাকে কারো ম্যারেজডে, বিজয় দিবস, পহেলা বৈশাখ পালন তো আছেই। এসব প্রোগ্রামে পড়াশুনার চিন্তা শিকেয় তুলে জম্পেশ খানাপিনা আর ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডায় মেতে থাকে স্প্রিংফিল্ডের ছোট্ট বাংলাদেশ কমিউনিটি। এমনই এক প্রোগ্রামে যখন দুর্বার আড্ডায় সবাই মত্ত তখন সাবিদের বউ আদুরে গলায় তিনাকে বলল, 'তিনা আমাদের বাসায় যেদিন তোমরা ছিলা, সেদিন নাকি আমার মেয়েকে দেখে তুমি চিৎকার করেছিলে? কথাটা শুনে আমি কিন্তু ভীষণ কষ্ট পেয়েছি।"

তিনার বিস্ময়াভিভূত জিজ্ঞাসা, 'আপনার মেয়ে?'

- আমাদের পুচি বিড়াল লোলার কথা বলছি, ও তো আমাদের মেয়ে।
- ওকে আপনারা পেয়েছেন কোথায়?
- কেন, বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসেছি।
- মানে! বিড়াল কি আনা যায়?

উত্তর দেয় সাবিদ, 'শোন তিনা, মিতির শর্ত ছিল বিড়াল ছাড়া আমেরিকা আসবে না। কি আর করা, আনতে হলো। তবে মিতিকে আনতে যতটা না ঝামেলা হয়েছে লোলাকে আনতে ঝামেলা হয়েছে তারচে দশগুণ বেশি। লোলার ছবি তোল, পাসপোর্ট কর, নানা রকম স্বাস্থ্য পরীক্ষা, অপারেশন করে ওভারী রিমোভ কর যেন লোলা এখানে বাচ্চা দিতে না পারে, লোলার গায়ে ইলেকট্রিক্যাল চিপ ইনসার্ট করো যেন লোলার পাসপোর্ট ব্যবহার করে অন্য বিড়াল আমেরিকা ঢুকে না যায়, আরো কত কী।

- অত ঝামেলা করে লোলাকে আনার হেতু কী?

উত্তর দেয় মিতি, 'জান তিনা, আমাদের ঢাকার বাসার আশেপাশেই ছিল লোলার মায়ের বসবাস, চলা-ফেরা। হঠাৎ একদিন ওর মা আমাদের বাসার ছাদে তিনটা বাচ্চা দেয়। একটা বাচ্চা মনে হয় কাক ঠুকোর দিয়ে মেরে ফেলেছিল, আর একটি বাচ্চাকে কে যেন নিয়ে গিয়েছিল। বাকী ছিল লোলা, আমি লোলাকে দেখে রাখতাম। একদিন আমাদের বাসার তিনতলার এক নিষ্ঠুর মেয়ে লোলাকে ছাদ থেকে নিচে ফেলে দেয়। তখন লোলার নাক ফেটে যায়, পা ভেঙ্গে যায়। আমি কান্নাকাটি করে আব্বুকে নিয়ে ওর চিকিৎসা করাই, নাকে চারটা সেলাই লেগেছিল, পায়ে ব্যান্ডেজ করতে হয়েছিল, ও খেতে পারত না। আমি ড্রপার দিয়ে অনেক কষ্টে দুধ খাইয়ে ওকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। এবার বলো আমার এ বাচ্চাটাকে দেশে ফেলে আসা কী আমার পক্ষে সম্ভব?

- উত্তরে তিনা কেবল একটু হাসতেই পারল।

দাওয়াতহীন উইকেন্ডের দুপুরে, খাবারের পরেই ল্যাপটপ নিয়ে বসে পড়ে তিনা, রাত নয়টায়ও উঠতে পারে না। স্নিগ্ধ বলে, 'কি আজ খাওয়া দাওয়া হবে না?'

তিনার উত্তর, 'মনে হয় না, অনেকগুলো কাজের ডেডলাইন আছে, খাওয়া তো হবেই না, আজ রাতে ঘুমানোও যাবে না।

- খুবই ভাল, ডেডিকেটেড স্টুডেন্ট।
- ডেডিকেটেড না ছাই। কষ্ট করতে করতে আমার জান শেষ।
- তবুও তোমার কষ্ট কম, লিয়ন রিয়ার কথা ভাব। ওদের বাচ্চা আছে, পড়াশুনার পাশাপাশি বাচ্চাকে স্কুলে আনা নেয়া কর, খাওয়াও, গোসল করাও, ঘুম পাড়াও, মর্জি সহ্য কর, -- আরো বলব?
- থাম। তুমি তো শুধু দেখবে, কে আমার চেয়ে বেশি কষ্ট করে। কে একটা বিড়াল কোলে নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে সেটাতো দেখবে না।
- পশুপাখির প্রতি প্রেম ভাল আমি মানি, তবে একটা দায়িত্বহীন জীবন কতটুকু উপভোগ্য? তুমি যদি মনে কর দায়িত্বহীন জীবন উপভোগ্য তবে সে জীবন তুমিও বেছে নিতে পার, সমস্যা কী? তুমিও তো তোমার বাবা মায়ের অনেক আদরের প্রিন্সেস। আজকেই ড্রপ করে দাও পড়াশুনা, একটা বিড়াল এনে দেই কোলে নিয়ে বসে থাক। আমি না হয় তোমার আর তোমার বিড়ালের খরচ জোগাতে গ্যাস স্টেশনে কয়েক ঘন্টা কাজ করব।
- সত্যিই তো দায়িত্বহীন জীবন কতটা উপভোগ্য? চিন্তার রেখা তিনার কপালে।

স্নিগ্ধ তিনার কথোপোকথনের মাঝেই বেজে উঠে তিনার ফোন, ওপাশ থেকে বেলা ভাবী বলে, 'তিনা, আগামী শনিবার ক্লাব হাউজের পার্টিতে তোমরা যাচ্ছ?'

- কিসের পার্টি ভাবী?
- ওমা, বিলাইয়ের মা এখনও ফোন দেয়নি?
- না তো।
- আগামী শনিবার সাবিদ মিতির বিলাইয়ের বার্থডে। বাসায় এত মানুষের জায়গা হবে না, তাই ইউনিভার্সিটি ক্লাব হাউজে পার্টির আয়োজন হয়েছে॥

লাঠি

মিল্টন রোজারিও

ছবি: ইন্টারনেট

গাব্রিয়েল ডি'কস্তা শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নেমেই একটি টেক্সি-ক্যাব করে সোজা বড় বোন বিনিতার বাসা রাজাবাজার চলে আসে। গেইটে এসে কলিং বেলে চাপ দেয়। রবিন ড্রয়িং রুমের সোফায় শুয়ে টিভি দেখছিল। কলিং বেল বাজতেই দৌড়ে যায় গেইট খুলতে। স্যুটবুট পরা মাথায় ক্যাপ, দুই হাতে কাঁধে ব্যাগ, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা পরিহিত একজন অপরিচিত ভদ্র লোক দেখে রবিন ভয় পেয়ে যায়। গাব্রিয়েল রবিনকে দেখে বলে,

- হাই লিটিল চ্যাম্প! হোয়াটস্ ইউর নেইম? গেইটটা খুলে দাও।

গেইট না খুলে রবিন ভয়ে দৌড়ে মাকে ডাকতে চলে যায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে,

- মা মা দেখে যাও কে যেন এসেছে। চোখে কালা চশমা, মাথায় ক্যাপ, হাতে ব্যাগ! আমাকে বলে, হাই লিটিল চ্যাম্প! গেইট খুলে দাও।

বিনিতা রান্না ঘরে বসে সব্জি কাটছিল। ছেলের কথা শুনে অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকায়। শাড়ীর আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বলে,

- বলিস কি! কে আবার এলো এই সময়? চল তো দেখি।

দুর থেকে গেইটে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে দেখে বিনিতা ভাবে ছেলের কথা তো ঠিকই। মাথার কাপড়টা ভালো মত টেনে নিয়ে গেইটের কাছে যায় সে। গাব্রিয়েল দিদিকে দেখেই বলে ওঠে।

- হ্যালো সিস্টার কেমন আছিস?

গলার স্বর শুনেই বিনিতা চমকে ওঠে। বলে,

- ও তুই! গাবু!! হেসে দেয়। আমি তো তোকে দেখে চিনতেই পারি নাই। দাঁড়া চাবিটা নিয়ে আসি। পাগলটা এখনও পাগলই রয়ে গেছে।

বিনিতা চাবি এনে গেইট খুলে দেয়। একটা ব্যাগ গাবুর কাছ থেকে হাতে নিয়ে বলে,

- আয়, ঘরে আয়। তা'না জানিয়ে হঠাৎ চলে এলি যে?

এই কথা বলতে বলতে ছোট ভাইকে ড্রয়িং রুমে নিয়ে এসে বসায়। গাবু বলে,

- সারপ্রাইজ সিস্টার, সাপ্রাইজ দিলাম তোকে। এই গুড্ডু লিটিল চ্যাম্পটা কে রে? রবিন না?
- হ্যাঁ।
- ওহ্ হো। মাম্মা। কত্ত বড় হয়ে গেছে গুড্ডু।
- বড় হবে না তো কি। তুই তো ওকে ছয় মাসের বাবু রেখে গেছিলি।
- কাম ভাগিনা কাম। তোমার জন্য দেখো আমি কত্ত কিছু নিয়ে এসেছি।

রবিনের ভয় তখনও কাটে নাই। মায়ের পিছনে লুকিয়ে আছে। বিনিতা বলে,

- রবিন তো তোকে দেখে ভয় পেয়ে গেছে। এমন বেশভূষায় ও কখনও কাউকে দেখে নাই তো। রবিন এসো বাবা। এ হচ্ছে তোমার গাব্রিয়েল মামা। আমেরিকা থাকে। অনেক বৎসর পর দেশে এসেছে।
- হ্যাঁ তা'তো প্রায় আট/নয় বছর হবেই।
- তুই বস আমি তোর জন্য একটু ঠাণ্ডা আর নাস্তার ব্যবস্থা করছি।
- ঠাণ্ডা বা এক কাপ কফি হলেই চলবে দিদি। নাস্তা লাগবে না। বাংলাদেশের আবহাওয়াটা খুব সুন্দর রে। এগুলি পরে আমার এখন গরম লাগছে। আমেরিকায় অনেক ঠাণ্ডা। আমরা তুষারের ঠাণ্ডায় থাকি। ঘরের ভেতর হিটার জ্বালাতে হয়।
- তুই তোর ড্রেস চেঞ্জ কর আমি তোর জন্য নাস্তার ব্যবস্থা করছি।

এই কথা বলে বিনিতা ভাইয়ের জন্যে নাস্তা করতে যায়। রবিন মায়ের পিছনে পিছনে চলে যায়। গাবু তার স্যুটকেস খুলে। ভাগ্নেকে ডাকে।

- রবিন তুমি কোথায় যাচ্ছো মামা? এসো, এই দেখ আমি তোমার জন্য কি এনেছি।

রবিন ড্রয়িং রুমের দরজার পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখছিল। কিন্তু মামাকে প্রথম দর্শনের ভয়টা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নাই। মামা রবিনের জন্য একটি মোটরকার বের করে দেয়। গাড়ীর নিচে সুইস বুটাম টিপতেই মোটরগাড়ীটি লালনীল বাতি জ্বালিয়ে চলতে থাকে সাইরেন বাজিয়ে। হাতের রিমোট কন্ট্রোল নিয়ে গাড়ীটি ইচ্ছে মত এদিক সেদিক চালাতে থাকে গাবু। রবিন দেখে খুব খুশী হয়। এক পা দুই পা করে মামার কাছে আসে। গাবু রিমোটটি রবিনের হাতে দেয়। বলে,

- এটা এই ভাবে চালবে মামা।

রবিন চালাতে থাকে মামার দেয়া পুলিশের সাইরেন বাজানো মোটরগাড়ীটি। এমন সময় বিনিতা ভাইয়ের নাস্তা বানিয়ে নিয়ে আসে। বলে,

- ঘরে কি পুলিশ এসেছে নাকি? পুলিশের গাড়ী দেখছি।

রবিন মাকে দেখিয়ে বলে,

- মা দেখো, দেখো পুলিশের এই গাড়ীটা মামা আমাকে দিয়েছে।
- তুমি তো মামাকে দেখে ভয়ই পেয়ে গেছিলে।

রবিন লজ্জায় মাথা নিচু করে আঁড় চোখে মামার দিকে তাকায়। গাবু বলে,

- প্রথম প্রথম একটু লজ্জা ছিল এখন কোন লজ্জা নাই। কি ঠিক না মামা?
- গাবু তুই লং জার্নি করে এসেছিস। তাই ঠাণ্ডা পরে খা। এখন একটু গরম গরম কফি খেয়ে স্নান করে রেষ্ট নে। আমি রান্না শেষ করে তোকে ডেকে দেবো। রবিন তুমি এই গাড়ীর সাউন্ডটা একটু কমিয়ে খেলতে থাকো। মামা সেই আমেরিকা থেকে এসেছে। একটু রেষ্ট নিতে দাও।
- না দিদি থাক না ও এখানেই খেলা করুক। আমি পরে রেষ্ট নেবো। তুমি একটু বস তো। তোমার জন্যে কি এনেছি দেখবে না?
- আমার জন্যে আবার কি এনেছিস?
- এই দেখো। এটা কি পছন্দ হয়েছে?
- এটা কি হুয়াইট গোল্ডের?
- হ্যাঁ দিদি। তোমার পছন্দ হয়েছে?
- কি বলিস! পছন্দ হবে না আবার!
- এই বক্সে পুরো সেট আছে তোমার জন্য। আর এই ব্যাগে টি-সার্ট, ক্যান্ডিগুলো আমার এক মাত্র ভাগ্নে রবিনের জন্যে। তোর জন্য একটি জর্জেট শাড়ী আছে দেখ পছন্দ হয় নাকি!
- ঠিক আছে সব দেখবো। এখন তোর বাক্স

পেট্টরা সব নিয়ে আয় তোর ঘরটা দেখিয়ে দেই। সব ওখানে রাখ। ফ্রেস হয়ে নে। আমি রান্না করতে যাই।

- কি রান্না করবে দিদি?
- তোর পছন্দের সব খাবারই আছে। ইলিশ মাছ ভাজা, পাঙ্গাশ মাছের ভাজাকারি আর আমড়ার ডাল।

কয়দিনে রবিনের সাথে মামার খুব ভাব হয়ে গেছে। রবিন এখন মামাকে ছাড়া কিচ্ছু করতে চায় না। গাবু আমেরিকা থেকে আসার সময় প্লান করে এসেছে বেশ কয়দিন গ্রামের বাড়ীতে থাকবে। আর অল্প সময় ঢাকা থাকবে। একদিন রাত্রে খাবার টেবিলে গাবু বলে,

- দাদাবাবু কবে আসছে?
- এই তো আগামী সপ্তাহে।
- হ্যাঁ। আমি আসার আগে দাদাবাবুকে বলে এসেছি।
- গতকালকেও তো তোর দাদাবাবুর সাথে আমার কথা হলো। কোথায় আমাকে তো তোর কথা কিছু বললো না!
- আমিই দাদাবাবুকে আমার দেশে আসার ব্যাপরে কিছু জানাতে না করেছিলাম। তাই বলে নাই।
- তোর পাগলামী এখনও আছে দেখছি।
- তোমাকে আগে জানালে তা'হলে তো সারপ্রাইজটা থাকতো না দিদি। এই জন্য।
- কি বলেছে তোর দাদাবাবু?
- কি আর বলবে! বললো, থাকিস, আমি আসছি। এক সাথে বড়দিন করবো। দিদি এখন বল কবে গ্রামে যাবে? আমি কিন্তু গ্রামেই বেশিদিন থাকবো বলে দেশে এসেছি। ঢাকার শহরে, উফ্! এত্তো গাড়ী। যানজট, এত্তো মানুষ! তোরা থাকিস কি ভাবে? আমি তো কয়দিনেই হাঁপিয়ে উঠেছি।
- রবিনের পরীক্ষাটা শেষ হোক তারপর যাবো। এর মধ্যে তোর দাদাবাবুও এসে পড়বে। আমাদেরও প্ল্যান এবার গ্রামের বাড়ীতে বড়দিন করবো। শোন, এখন তুই রেষ্ট নে আমি রান্না করতে গেলাম।

এই কথা বলে বিনিতা রান্না ঘরে চলে যায়। গাবু রবিনের সাথে কথা বলতে থাকে।

- মামা, গ্রামে গিয়ে আমরা মামা ভাগ্নে ইচ্ছে মত ঘুরে বেড়াবো। কি মামা ঠিক আছে না?
- হ্যাঁ মামা। আমি আমার এই গাড়িটি নিয়ে যাবো।
- হা-হা-হা। অবশ্যই মামা। কত বৎসর পর নিজ গ্রামে যাবো। মাটির সোঁদা গন্ধ। ধান ক্ষেত, গাছে গাব পেকে আছে। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ইছামতি নদী। মামা তুমি কি নদীতে নেমে কখনো সাঁতার কেটেছো?
- না মামা। আমি তো ছোট। গাড়ীতে চড়ে বাড়িতে যাই। আবার গাড়ীতে করেই ঢাকায় আসি। আমি তো সাঁতার জানি না। রুদ্র ঈশান কলিন্সরা জানে।
- ওরা কারা তো বন্ধু বুঝি?
- হ্যাঁ। বন্ধুও ভাইও।
- আচ্ছা খুব ভালো। গ্রামে গেলে সবার সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে, ঠিক আছে।

রবিন মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। দুবাই থেকে গিলবর্টি ছোট ভাই রবার্টকে আগেই জানিয়ে রাখে যেন তাদের ঘর-বাড়ীটা স্বপ্নার মাকে দিয়ে সুন্দর করে পরিষ্কার করে রাখে। বিনিতাও দেবর রবার্টকে একই কথা বলেছিল। পরের সপ্তাহে গিলবার্ট আসে দুবাই থেকে। গাবু বিনিতা রবিনকে নিয়ে এয়ারপোর্টে যায় তাকে আনতে। রবিন বাবাকে পেয়ে খুব খুশী হয়। গাড়ীতে বসেই বাবাকে মামার কথা বলতে থাকে।

- জান বাবা, মামা আমার জন্য খুব সুন্দর একটা পুলিশের গাড়ী এনেছে। আর কত ক্যান্ডি এনেছে জান? আমি খেয়ে শেষ করতে পারবো না।
- তাই নাকি বাবা? আচ্ছা ঠিক আছে। আমি তোমার জন্য যে সব ক্যান্ডি এনেছি সেগুলি রুদ্র, ঈশান আর কলিন্সকে দিয়ে দিবো। ঠিক আছে না!
- না। রুদ্রকে দিবে না। ও আমাকে ওর সাইকেল চালাতে দেয় না।
- তুমি তো ঠিক মত সাইকেল চালাতে পারনা, তাই দেয় না। যদি পড়ে যাও, ব্যথা পাবে যে। রুদ্র অনেক ভাল।

রবিনের এই কথা শুনে বিনিতা আর গাব্রিয়েল হেসে দেয়। গাব্রিয়েল বলে,

- মামা আমি তোমাকে একটি সাইকেল কিনে দিবো। রুদ্রর সাইকেলের চেয়ে অনেক সুন্দর।

কথা বলতে বলতে ওরা এক সময় বাসায় এসে পৌছে যায়। সপ্তা খানেক পর বাসায় তালা মেড়ে সবাই গ্রামে চলে আসে। বাড়ীতে এসে দেখে সব কিছু সুন্দর পরিপাটি করে রেখেছে ছোট ভাই রবার্ট আর তার বৌ নমিতা। বাড়ীর উঠানের পাশে কাগজী লেবুর গাছটি আরো সুন্দর হয়ে বেড়ে উঠেছে। গাছের কঁচি সবুজ পাতার নিচে বেশ কয়েকটি কাগজী লেবু ঝুলে আছে। লেবু গাছটি ঘিরে নমিতার বড় বড় গেন্দা ফুলদল যেন ওদের দেখে হাসছে। ডান দিকে লম্বা সারি বেধে লাল গেন্দা ফুল ফুঁটে আছে। দুর সম্পর্কের এক পিসিমা থাকে গিলবার্টের ঘরে তার এক মাত্র ছেলে দেবুকে নিয়ে। দেবু বান্দুরা বাজারে মোবাইল টিভি মেরামতের কাজ করে। গাবু আসার খবর শুনে খুব খুশি সবাই। পরদিন গাবু ভাগ্নেকে নিয়ে গ্রামে ঘুরতে বের হয়। মেয়েদের স্কুল পেরিয়ে হাসনাবাদ গির্জা দেখে গ্রামের ভিতর দিয়ে বাড়িতে আসতে থাকে তারা। হঠাৎ বেনীর কথা গাবুর মনে পড়ে যায়। ভাগ্নে রবিনকে বলে,

- মামা তুমি কি বেনী পাগলাকে দেখেছ?
- না মামা। কোথায় থাকে বেনী পাগলা মামা?
- চল তোমাকে বেনী পাগলার বাড়ীটি দেখাই। জান মামা, বেনী পাগলার সাথে আমার খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। আমার সাথে সে কখনো পাগলামী করে নাই। কিছু দুষ্ট ছেলে শুধু শুধু বেনীকে খেপাতো।
- মামা পাগল কি ভাল হয়?
- হ্যাঁ মামা। পাগলও ভাল হয়। কিন্তু ওকে মনে হয় কেউ ঠিক মত চিকিৎসা করায় নাই। তাই পাগলের মত এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়।
- মামা, এইযে এটা পাগলার বাড়ী।
- এই বাড়ীতে এখন কে থাকে মামা?
- থাকে তার আত্মীয়-স্বজনরা।
- চল এই বাড়ীর উপর দিয়ে যাই।
- না মামা আমার ডর করে।
- আরে ধুর বোকা! বেনী পাগলা তো এখন নাই। বৎসর কয়েক আগে কোথায় জানি চলে গেছে। দাঁড়াও মামা, দাঁড়াও। একটা জিনিস পাইছি।
- কি জিনিস মামা।
- দুস্তের লাঠি।
- দুস্তের লাঠি মানে?
- আরে মামা, এই লাঠি সব সময় বেনী পাগলার হাতে থাকতো। বাড়ীর মানুষ যত্ন করে কয়টা লাঠি রশি দিয়ে বেঁধে ঘরের চালের উপর রেখে দিয়েছে। যাক, বেনীর হাতের একটা চিহ্ন পাইলাম। চল মামা এখন বাড়ীতে যাই।

গাব্রিয়েল বাড়ীতে আসলে দাদাবাবু জিজ্ঞেস করে,

- মামা ভাগ্নে কোথায় কোথায় ঘুরে এলে?
- এই তো দাদাবাবু, গ্রামটা একটু ঘুরে দেখলাম। কত বদলিয়ে গেছে গ্রামটি। আগের সেই গ্রাম এখন আর চেনাই যায় না।

গাবুর গলার আওয়াজ পেয়ে বিনিতা এগিয়ে আসে। বলে,

- অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছে মামা-ভাগ্নের। এবার এসো রবিন তোমাকে স্নান করিয়ে দেই। গাবু তুইও যা স্নান করে আয়। তোর দাদাবাবুর স্নান হয়ে গেছে।

গাব্রিয়েল বেনীর লাঠি হাতে নিয়ে তার ঘরে গিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়ে। ওদিকে রবিনকে স্নান করিয়ে বিনিতা টেবিলে ভাত বেড়ে সবাইকে ডাকে। গাবু না আসাতে তার ঘরে গিয়ে দেখে সে শুয়ে আছে। অবাক হয়ে বিনিতা গাবুকে জিজ্ঞেস করে।

- কি রে শুয়ে পড়লি যে! শরীর অসুস্থ লাগছে নাকি? এই তুমি কোথায়? এখানে আসো তো। দেখে যাও গাবুর যেন কি হয়েছে।

গিলবার্ট স্নান সেরে চুল আচড়াচ্ছিল। বিনিতার

ডাক শুনে তাড়াতাড়ি গাবুর কাছে আসে। এসে দেখে গাবু বেনীর মত তার খাটের উপর বসে আছে। হাতে লাঠি। এই অবস্থা দেখে গিলবার্ট জিজ্ঞেস করে।

- কি রে তুই এমন করে বসে আছিস কেন?
- আমর ইচ্ছা অইছে তাই বইয়্যা রইছি। তুমরা যাও।
- আমরা যাবো মানে! তুই ভাত খাবি না? খিদা লাগে নাই তোর? আমার তো খুব খিদা পেয়েছে। চল খাবি।
- একটা বিড়ি দেও তো।
- ভাত খেয়ে বিড়ি খাবি। এখন চল।
- না
- ভাত খেয়ে বিড়ি খাবি। এখন চল।
- না। আমি বিড়ি খাইয়্যা ভাত খামু।

বিনিতার ভাইয়ের এই অবস্থা দেখে চোখে জল এসে পরে। বলে,

- ওর কি হলো! এমন করছে কেন? তুমি একটা কিছু কর।

গাবুর এই অবস্থার কথা শুনে সবাই তার ঘরে আসে। দেখে গাবু বেনীর মতই তার ঘরে বসে বসে সিগারেট টানছে। বাড়ীর কাজের বুয়া বলে,

- বৌদি ভাইয়ারে বেনী পাগলা ভুতে ধরছে।

এই কথা শুনে রবিন মাকে জড়িয়ে ধরে। ভয় পেয়ে যায়। গিলবার্ট বলে,

- বুয়া তুমি বাহিরে যাও। তোমার কাজ কর গিয়ে। এখানে বাজে কথা বলবে না।

বিনিতা বুয়ার কথায় গুরুত্ব দেয়। বলে,

- রবার্ট কোথায়? ওকে একটু গির্জায় পাঠাও। ফাদার আবেল আছে গির্জায়। তাকে নিয়ে আসুক।

এমন সময় রবার্ট বাড়িতে আসে। গাবুর কথা শুনে তার ঘরে যায়। দেখে ঠিকই গাবুর হাতে লাঠি আর বসে বসে সিগারেট টানছে। বিনিতা কাঁদো কাঁদো স্বরে রবার্টকে বলে,

- ঠাকুরপো, তুমি এক্ষুনি গির্জায় যাও। বড়দিনের জন্য ফাদার আবেল হাসনাবাদ আসছে। তাকে একটু নিয়ে আসো।

গিলবার্ট ও ছোট ভাইকে বলে,

- তুই একটু যা ফাদার আবেলকে ডেকে নিয়ে আয়। এখন অবশ্য ফাদারদের রেষ্ট নেয়ার সময়। সাড়ে তিনটায় আবার পাপস্বীকার শুনতে বসবেন। তুই শীঘ্র যা।

রবার্ট তাড়াতাড়ি গির্জায় চলে যায়। ফাদারকে বলে সাথে করে বাড়ীতে নিয়ে আসে। গাবুর ঘরে গিয়ে দেখে সে অমনি বসে রয়েছে। এক হাতে লাঠি আর এক হাতে সিগারেট। ফাদার বলে,

- ওর নামটা যেন কি? গিলবার্ট বলে,
- গাব্রিয়েল।
- এই গাব্রিয়েল, তোমার কি হইছে?

ফাদারকে দেখে গাবু সোজা হয়ে বসে। হাতের সিগারেট ফেলে দেয়। কোন কথা বলে না। ফাদার আবার বলে,

- এই গাব্রিয়েল তোমার হাতের লাঠিগুলি আমাকে দাও তো।

সুবোধ বালকের মত গাবু ফাদারের সব কথা শুনতে থাকে। হাতের লাঠিগুলি ফাদারের হাতে দেয়। ফাদার আবার বলে,

- গাব্রিয়েল কার নাম তুমি জান? গাব্রিয়েল হচ্ছেন স্বর্গের একজন অনেক বড় দূত। যে কুমারী মারীয়াকে দর্শন দিয়েছিলেন। পাঁচদিন পর বড়দিন। এখন ওঠো। যাও, হাতমুখ ধুয়ে খেতে বস। দেখ তোমার জন্য সবাই বসে আছে। কেউ এখনও খায় নাই।

গাবু উঠে ভদ্র ছেলের মত সোজা বাথরুমে চলে যায়। হাতমুখ ধুয়ে আসে। সবার সাথে খেতে বসে। ফাদার বলে,

- আমি এখন যাই। সাড়ে তিনটায় পাপস্বীকার শুনতে হবে।
- একটু চা দেই ফাদার।
- না। আমি এখন কিছুই খাব না। অন্যদিন এসে খাবো। এই লাঠিগুলো আমি নিয়ে যাবো। ফাদার এই কথা বলে লাঠিগুলো নিয়ে চলে যায়। গিলবার্ট বিনিতাকে বলে, চল আমরাও খেতে বসি॥

এক পশ্‌লা বৃষ্টি

রবার্ট এ চিরান

ময়মনসিংহ শহরের কৃষ্টপুরে ভাড়া বাসায় থাকি। বেশ কয়েক বছর হলো। খাই-দাই আর বিকেলে শহর চষে বেড়াই। নয়তো বন্ধুদের সাথে জোস আড্ডা দিই রোজ। কোথাও যাবার নেই মানা। পড়াশোনা শিকেয় তুলে দিয়েছি। তার মানে- বিএ পাশের পর পাক্কা দু'টি বছর কাঁটিয়ে দিয়েছি দিব্যি। মাঝে মাঝে সাহিত্য চর্চার নামে বিস্তর মনের উপর ছুরি চালিয়েছি। অত্যাচার চালিয়েছি শরীরের উপরও। তারপরও, সাহিত্য আর হলো কৈ! প্রেম নামক এক পাখী এসে সমস্ত কিছু তছ্‌নছ্‌ করে দিয়ে গেছে আমার সাধের হৃদয়টাকে। কি আর করা! আদুভাই হয়ে ব্যর্থ প্রেমিক সেজেছি। লালপানীয় গলাধঃকরণ করতে করতে কখন ছাত্রত্ব চলে গেছে টেরই পাইনি। যখন টের পেলুম, দেখি আমার মনটাই সেকেলে! তার সাথে জীবনটাই আস্তাকুঁড়ে পড়ে থাকল। না, পড়া-শোনা ঠিকই ছিল কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকতা ছিল না। পড়াশোনা তুলে দিয়েছি বলতে- মাস্টার্সে দর্শন শাস্ত্রে প্রিলি দু'দুবার দিয়ে ফেইল মেরেছি। কাজেই পড়াশোনাতে কোন দায়বদ্ধতা নেই। প্রয়োজনে আবার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেব-এই হলো অভিপ্রায়। মাঝে বড়দিদির উপর মানসিক চাপ প্রয়োগ- এই আর কি! তবে, ছাত্রত্ব নিয়ে বড় ঝামেলায় পড়ে যাই, যখন কেউ আদু ভাই বলে সম্বোধন করে বসে। বিব্রত হই কিন্তু কিছু বলি না। নতমস্তকে তথাস্তু বলে চলে আসি।

এর মধ্যে আবার বিভিন্ন ফাংশান-টাংশান থাকে। যেখানে না গেলেই নয়। বন্ধু-বান্ধবদের নাছোরবান্দা আব্দার, চারপাশের প্রকৃতি-পরিবেশ, বাস্তবতার টান, নিজের মনেরও টান। উভয় সংকটে পড়ে নিয়মিত সেই সব অনুষ্ঠানে যাই, উপভোগ করি। কিন্তু নিজে কিছু করি না। আসলে আমি নিজে কিছু করতে পারি না। মাঝে মাঝে মন যখন না হয়ে ওঠে, তখন সবার অগোচরে পালিয়ে আসি। যে বাসায় ভাড়া থাকি, সেখানে আবার তিন বন্ধুও থাকে। বন্ধুদের মধ্যে দুইজন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে পড়ে। অন্যজন একটা এনজিওতে চাকুরী করে। তাদের সময় কম, আমার আবার অফুরন্ত। এই অফুরন্ত সময়টা কাঁটানোর জন্য একটা কিছু করাতো চাই। চাকুরী! না! সেটা আমার ধাতে সয় না। তাই সেই মুখো হয়নি। অগত্যা সাহিত্য চর্চা। বন্ধুদের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ, যে সাহিত্য ভালবাসে- তার কাছ থেকে বই ধার করে পড়ি। দিন যায় দিন আসে। আমিও আছি। তাই প্রতিদিনকার ফিরিস্তি গাইতে গাইতে চার বন্ধুর দিন কাটে।

ব্যাচেলর মানুষ। এইসব মানুষের আবার সখের কোন শেষ নেই। আবার দিনেরও কোন বদল নেই। দিনকে দিন আড্ডা আর চলতি ঘটনার মূখরোচক গল্প করেই দিন কাটে। তারই ফাঁকে কত সপ্তাহ পার করে দিই তার কোন ইয়ত্তা থাকে না। আড্ডা জমিয়ে দুপুরে কিংবা বিকেলে খেয়ে -দেয়ে দে বিশ্রাম। তো পড়ন্ত বিকেলে ময়মনসিংহ শহরটাকে বেশ লাগে। বিশেষ করে বর্ষার বিকেল বেলাটা। আবির মাখা এই ক্ষণগুলো জীবনের এক একটা অধ্যায় যেন! চারপাশের মুহূর্তের গুমোট ভাবটা ঝেরে ফেলে হঠাৎ বৃষ্টি- বেশ ভালই লাগে। কখনো কখনো দেখি বিস্ফারিত আকাশ মুহূর্তেই অন্ধকার। হয়তো বৃষ্টি হতে পারে কল্পনা করতে করতেই হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। অঝোর ধারায় বৃষ্টি। জানালার পাশে বসে বৃষ্টিপড়া দেখতে বেশ লাগে। এরই মাঝে আবার দিনটা যদি রবিবার হয়, তো বয়েই গেল। একান্ত বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ আর হইহুল্লোড়। দিনটা ভালই কাটে।

এই তো আজকে আবার রবিবার। রবিবারটা যে কখন এসে হাজির হয় টের পাইনে। মনটা আজ কেমন উড়ু উড়ু ভাব। বোধহয় এক্ষুনি মেঘমাল্লার রাগে বৃষ্টি নামবে গির্জার ঘন্টার সাথে পাল্লা দিয়ে। গির্জাবার; মানে ঈশ্বর দত্ত বিশ্রামবার। দিনটা ঈশ্বরের জন্য নিবেদিত-বরাদ্ধ। ময়মনসিংহ ক্যাথেড্রালের গির্জার শ'তিনেক গজ দুরত্বে থাকি। তাই গির্জার ঘন্টা ধ্বনি সহজেই কানে বাজে। এই মুহূর্তে ক্যাথেড্রালের গির্জার ঘন্টাটাও বেজে যাচ্ছে। সেই ঘন্টার মধুর ধ্বনি একসময় মিলিয়ে একাকার হয়ে যায় শহরের কোলাহল ছাপিয়ে প্রকৃতিতে। আমিও সেই ঘন্টার সাথে নিজেকে মিলিয়ে নিই। সেই ঘন্টা ধ্বনি পিছু ধাবিত হয়। কখন যে সেই ঘন্টার অনুরণিত ছন্দের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি, কে জানে? মনে হয় আমি সেই ঘন্টাধ্বনির মায়াজালে পড়ে গেছি। বোধ হয় তার জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করি। রবাহূতের ন্যায় আমার পা দু'টো যেন সেদিকে চলতে থাকে। গির্জার সেই মিষ্টি-মধুর ধ্বনি আমার গভীর অন্তরীক্ষে আঘাত হানে- আমাকে টানে। অজান্তেই আমি সেই ঘন্টার মিষ্টি ধ্বনির প্রেমে পড়ে যাই। পারত পক্ষে রবিবারের উপাসনা মিস করি না। আমি উপস্থিত হই অতি উৎসাহের সাথে। কেন এমন হয়, আমি নিজেও বুঝতে পারি না। তো সেই রহস্য ভেদ করব এমন মানসিকতা কোন দিন মনে উঁকি দেয়নি-করিওনি। মাঝে মাঝে যে নিজের কাছে প্রশ্ন করিনি তা নয় কিন্তু সেই পর্যন্তই।

সেইসব প্রশ্ন ছাঁপিয়ে বড় প্রশ্ন মনে উঁকি-ঝুঁকি মারে। আমি কি মৃত্যু নামক ঘাতককে ভয় পাই? আমি কি সত্যই ঈশ্বরভক্ত একজন? তাও তো নয়। আমার মধ্যে সেই সাধুতার লেবাস কোথায়? এই অসুখ কখন মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে; এতদিন তো সেটার টের পাইনি? আমি কি এমনি এমনি গির্জায় যাই? কৈ? ঈশ্বরত্বকে ধারণ করার মতো তো আমার কোন যোগ্যতা নেই? সেটা প্রমাণ করার মতো আমার মধ্যে কোন উপলক্ষ্যটাও নেই। বন্ধু-বান্ধব তারাও তো কোনদিন এই সম্পর্কে কোন উচ্চ-বাচ্য করেনি! খ্রিস্টবিশ্বাসে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিজেকে যে সম্পৃক্ত করেছি তেমনও না। তাহলে? অদৃশ্য কোন কারণ! না! তেমন একটা কারণও নেই। তবুও মাঝে মাঝে লোকে বলে- এবার বুঝি রতন সাধু বনে গেল! আর আমি ভাবি- এবার বুঝি আমার লেবাসটা খসেই গেল!

তবুও যাই, যেতে ভাল লাগে। পড়ন্ত বিকেলের সেই ভাব-গাম্ভীর্যে ভরা মধুময় ক্ষণটি আমাকে টানে। হাজার হোক, আমিও খ্রিস্টকে বিশ্বাস করি। তিনি আমারও ত্রাণকর্তা মানি। কষ্টদায়ক খ্রিস্টের সেই ক্রুশীয় মৃত্যু আমিও বিশ্বাস করি। আমিও তাঁকে ধারন করি। পৃথিবীর এই রঙ্গমঞ্চে কৃত যত পাপ, আমাকেও ভাবায়। ক্রুশের স্বাদ নিতে আমিও চাই। এই পাপিষ্ঠ মনে মুক্তির আস্বাদ আমিও লালন করি। হাজার ব্যর্থতার মাঝে, লোকারণ্যে আমিও খুঁজি এতটুকু শান্তি, পরিত্রাণের আশায় বুক বাঁধি। একান্তই ব্যক্তিক, আত্মশ্লাঘায় নিজেকে কষ্ঠি পাথরে যাচাইয়ের প্রচেষ্টা চালাই।

বিশ্রামের দিন; রবিবার। হ্যাঁ, রবিবারই তো। রবিবারের বিকেল। আজকের বিকেলটা চমৎকারই বটে! বিশ্রামবার। কার? মানুষের? না মানুষের না-জাগতিকের, নাহ! ঈশ্বরের। মানব জগতের নয়। এই অবচেতন মানুষকে

জাগ্রত করার জন্যে গির্জার ঘন্টা ধ্বনি বুঝি বেঁজে যাচ্ছে অবিরত। মানুষ যে অচেতন।

এখন কয়টা বাঁজে? বিকেল ৫টা! মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। বর্ষাকাল। ভরা বর্ষা চারদিকে। তার আভাস আমার চারপাশে। বিশ্রামবার কিন্তু আমার বিশ্রাম নেই। সেই সকাল থেকে বসেছিলাম একটা লেখা নিয়ে, কাগজে দেব বলে। দুপুরে খেয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, খেয়াল ছিল না। বন্ধুরা চলে গেছে শহরে। বাসায় আমি একা। শহরের কোলাহল কানে এসে লাগছে। কোথাও যেন কোন বিশ্রাম নেই। দূরন্ত এই সময়ের সাথে শহুরেরা অভ্যস্ত। কে কি করছে তার কোন হদিস রাখে না। নিজ নিজ নেশায় ও পেশায় ওরা বুদ্ হয়ে থাকে। ঘড়িতে দেখলাম ৫টা বেঁজে ১৫ মিনিট। পাশের বাসার খ্রিস্টান ভাড়াটিয়া ছোট্ট শিশুকে নিয়ে ব্যস্ত। তারাও বোধ হয় প্রস্তুতি নিচ্ছে গির্জায় যাওয়ার। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সেইসব দৃশ্যগুলো কল্পনা করছি আর মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করছি। কখন যাব- কখন যাব? আলসেমী ভেঙ্গে বিছানা থেকে উঠে হাত-মুখ ধূ'লাম। তারপর পোশাক পাল্টিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ব গির্জার উদ্দেশে- এই অভিপ্রায়ে।

পাশের বাসায় ভাড়াটিয়াদের সাথে দীর্ঘদিনের পরিচিতি। ছোট্ট সংসার- একটি মাত্র মেয়ে সন্তান নিয়ে তাদের পরিবার। তাই মেয়ের আদর আর যত্নের সীমা নেই। মেয়েটা আধো আধো কথা বলে। শুনতে বেশ ভালই লাগে। বয়স দুইয়ের মতো হবে। বিশপ হাউসটা বাসা থেকে বেশী দুরে নয়। তিনশো গজের মতো হবে বোধ হয়। সেখানেই ক্যাথি ড্রাল গির্জা। সাদামাটা ভাস্কর্যের কারুকাজ। কিন্তু পবিত্রতায় যেন সমুজ্জ্বল। তারই সুক্ষ আবেদন উপচে পড়ছে চারদিক। যা দেখলে মনে এমনিতেই প্রশান্তি আসে। বিশেষত্বটা সেখানেই। আমি সেই পবিত্রতায় আকীর্ণ গির্জাতেই যাচ্ছি অলস ভঙ্গিতে, ধীর লয়ে - ব্যস্ততাটাকে পেছনে ফেলে। তাড়াহুড়ো নেই।

আমার সামনে ৫০ গজ দুরে ওরা মানে পাশের বাসার ভাড়াটিয়া তাদের সেই ছোট্ট শিশুটি নিয়ে যাচ্ছে হেঁটে হেঁলে-দুলে। তাদের পিছে পিছে আমিও। তাদেরকে অনুসরণ করে। একসময় আমরা বিশপ হাউসে পৌঁছলাম। সরাসরি গির্জা ঘরে ঢুকে নিজ আসন খুঁজে নিলাম। গির্জা যখন প্রায় শেষের দিকে- বের হওয়ার জন্য দরজার দিকে পা বাড়ালাম। দেখি পূর্ব পরিচিত অন্তরা সাংমার সাথে আরেক নতুন মেয়ে কি নিয়ে আলাপ করছে বারান্দার ওপাশে। আমাকে দেখে অন্তরা সাংমা সম্ভাশন জানাল। সেই অপরিচিতের দিকে এক পলক দেখে মনে হলো- সে বোধহয় নতুন এসেছে কলেজ হোস্টেলে। আমি এমনিতেই লাজুক প্রকৃতির। তাই মেয়েটি সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকলেও অন্তরাকে জিজ্ঞেস করা হল না। মানে- জিজ্ঞেস করার সাহস পেলাম না। অধোঃ মুখে গেইটের দিকে পা বাড়াচ্ছি- ওমনি অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামতে শুরু করল। কোনক্রমে গেইটের লাগোয়া একটি ঘর, যেখানে বিশপ হাউসের স্বনামধন্য ম্যানেজার আ:চ্চু থাকেন, সেখানে দৌড়ে আশ্রয় নিলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি আর ভাবছি। ভাবনা ছাপিয়ে সেই সদ্যদেখা মেয়েটির মুখ বার বার ভাসছে। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিই- কেন এই ভরা বর্ষায় খালি হাতে গির্জায় এলাম। সাথে ছাতা থাকলে তো এমন বিপদে পড়তে হতো না। দেখলাম- সন্মুখ দিয়ে চলে গেল ঈশ্বরভক্ত স্বর্গ পিয়াসী সকলে এক এক করে। পাশের বাসার সেই পরিচিত পরিবারও। ছোট্ট শিশুটি আমাকে দেখে মামা বলে তার উপস্থিতি জানান দিয়ে টাটা বলে চলে গেল। আর আমি একা দিব্যি প্রহর গুণছি কখন বৃষ্টি ছাড়বে। সঙ্গীহীন একা একা দাঁড়িয়ে আছি বারন্দায়। মানে, আমি এমন বোকা মানুষ যে, ছাতা আনিনি! সমবয়সী চেনা বন্ধু কেউ আসেনি গির্জায়; যার সাথে আমি যেতে পারি। মাঝে মাঝে গির্জার বারান্দার দিকে তাকাচ্ছি। অন্তরার সাথে নতুন মেয়েটির দিকে আড় চোখে তাকাই। তারা আলাপ করে যাচ্ছে তখনও- শেষ হয়নি। মনে মনে ভাবি- ফিরে গিয়ে অন্তরার কাছে একটা ছাতা ধার নিয়ে আসি। কিন্তু মনে জোর পাচ্ছিলাম না এই ভেবে যে, নতুন মেয়েটি আবার কি ভাবে! তখনও বৃষ্টি ছাড়ার কোন নাম নেই। অগত্যা মনটাকে প্রবোধ দিয়ে বের হই বৃষ্টির মাঝে। আমি গেইট পার হয়ে গলিপথে নেমেছি। আবিষ্ট মনে হাঁটছি গলি পথ ধরে। মেইন রাস্তা- যেটা ব্রহ্মপুত্রের দিকে চলে গেছে সেদিকে। বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যা রাত। ভিজে একাকার হয়ে গেছি। গলি পথটা আবছা অন্ধকারে ঢাকা। রাস্তার নিয়ন বাতিগুলো সবে জ্বলতে শুরু করেছে। দোকান পাট খোলা থাকলেও সকলে ভিতরে বসে আড্ডা দিচ্ছে। কাজেই রাস্তাটা একদম ফাঁকা। সেই গলি পথের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি আর বাঁ দিকে মোড় নিতে যাচ্ছি তখনই এক অপরিচিত মেয়েলী কণ্ঠের ডাক শুনতে পেলাম।

দাদা, একটু দাঁড়াও-----

আমি ইতস্ততঃ করছি। সে কি আমাকেই ডাকল নাকি অন্য কাউকে? কিন্তু আমি ছাড়া তো এই মুহূর্তে রাস্তায় কেউ নেই। আমি কি দাঁড়াব নাকি দাঁড়াব না-এই যখন ভাবছি, তখনই মেয়েটি আবার ডাকলে-

দাদা-একটু দাঁড়াবে!

কেমন আকুতি ভরা ডাক! পিছনে চেয়ে দেখি- আবছা অন্ধকারে মেয়েটি এগিয়ে আসছে। মেয়েটি কে হতে পারে তা ঠাওর করার জন্য চেষ্টা করছি কিন্তু সন্ধ্যার আবছা-অন্ধকারে চেনা যাচ্ছিল না। যখন সে কাছাকাছি চলে এলো, ততক্ষণে তাকে চিনে নিয়েছি। এই যে সেই মেয়েটি! একটা ছোট্ট রঙ্গিন ছাতা করে এদিকে এগিয়ে আসছে দ্রুত পায়ে। যাকে আমি কতক্ষণ আগে মাত্র অন্তরার সাথে আলাপ করতে দেখেছি। যার পরিচয় জানার জন্য আমার মনটা তখন থেকেই নিস্পিস্ করছিল। সে-ই আমাকে দাঁড়াতে বলছে! কোন বিপদে পড়েনি তো! ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। সে ততক্ষণে আমার একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে। সে কাছে আসলে পর জিজ্ঞেস করলাম-

আমাকে বলছ?

'হ্যাঁ দাদা।' আমি যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। আর বললাম, কোন সমস্যা?

না, তেমন কোন সমস্যা নয়। আমিও সেখানে যাব কি না; তাই।

কোথায়?

তুমি যেখানে থাকো, সেখানে!

এ দেখছি আরেক বিপদ, মনে মনে ভাবলাম। অনুচ্চারিত কথাগুলো মনে রেখেই তাকে বললাম-

আমি কোথায় থাকি তা তুমি জানো! চেনো?

চিনি না। অন্তরাদি বলল যে, তুমি যে বাসায় থাকো সেখানে আমার দিদিরা থাকে। সেই তোমাকে দেখিয়ে দিল।

সেখানে আশপাশে তো কয়েকটি পরিবার থাকে। কার বাসায় যাবে?

তুমি যে বাসায় ভাড়া থাকো, তার বিপরীত বাসায়। আমার আর বুঝতে বাকী থাকল না যে, সে সেই ছোট্ট শিশুটির মা-বাবার কথাই বলছে। তাই, আমি আর কথা বাড়ালাম না। তাকে আহ্বান জানিয়ে বললাম-

তাহলে এসো-

পাশাপাশি হাঁটছি। তার নিঃশ্বাস আমি যেন টের পাচ্ছি, আমার ঘাড়ে এসে লাগছে। এই বৃষ্টিস্নাত ঘোর সন্ধ্যায় এক যুবক আর এক অজানা যুবতী পাশাপাশি হাঁটছে। তা যে কোন যুবকের জন্য এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অবশ্যই। আর বাস্তবতার নিরিখে অনভিপ্রেতও। তখনও বৃষ্টি হচ্ছে। আমি প্রায় ভিজে চুপসে গেছি। মাথা থেকে বৃষ্টির জল

(১২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

গ্র্যান্ডমাদার

জেন কুমকুম ডি'ক্রুজ

অশীতিপর বৃদ্ধা মাকে ছেলে সলোমন ও মেয়ে পলিনা প্রায় মাস খানেক নার্সিং হোমে রাখার পর বাসায় নিয়ে এলো। মা হঠাৎ স্ট্রোকের মত করেছিল। শরীরের বাম দিকটি প্রায় অবশই হয়ে গিয়েছিল। ফিজিওথ্যারাপির ফলে এখন অনেকটাই সুস্থ। কিন্তু স্ট্রোকের পর আর কথা বলতে পারে না সে। বলতে গেলে বোবাই। কিন্তু ইশারায় সব বোঝে। মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বা নাও বলতে পারে। ডাক্তার অনেক চেষ্টা করেও তার মুখে বুলি ফুটাতে পারেননি।

প্রথমে নার্সিং হোম থেকে পলিনাই মা'কে তার বাসায় নিয়ে তোলে। যাক মা আরো কিছুদিন বাঁচবেন এটাই শান্তি। আমেরিকা ভীষণ রকমের এক যান্ত্রিক দেশ। এখানে আবেগের কোন দাম নেই। যন্ত্রের মতোই সবার জীবন এক ভয়ংকর ছকে বাঁধা। ছক অনুসারে চললে ভালই যদি তা না হয় তবে সব নিমেষেই হয়ে যাবে এলোমেলো। মাস শেষ হতেই বাড়ির কিস্তি, গাড়ির কিস্তি, মেডিকেল ইন্সুরেন্স, কারেন্ট-গ্যাস, পানির বিল ইত্যাদি। কিন্তু মেয়ে পলিনা কাজের অবসরে যতটুকু পারে মায়ের সেবাযত্ন করে। সে তার কলেজ পড়ুয়া ছেলে ববি ও মেয়ে কেটিকেও নির্দেশ দিয়েছে যেন গ্র্যান্ডমার কোন অযত্ন না হয়।

কিন্তু মাস খানেক না যেতেই বাবা-মার অনুপস্থিতে ববি ও কেটি নানা রকম বিদ্রুপাত্মক কথা বলে গ্যান্ডমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে। একদিন নাতি ববি ঘরে ঢুকেই বলে, ঔষধের গন্ধ আর ভাল লাগে না। বাবা এলে বলবো তোমাকে বেজমেন্টে বিছানা পেতে দিতে। তাছাড়া কতদিন হয়ে গেল বন্ধু-বান্ধবকেও বাসায় আনতে পারছি না। আড্ডা তো দূরে থাক। নাতনী কেটিও টিপ্পনি কেটে বলে, কী মজা করে শুয়ে আছে দেখ। খাচ্ছে দাচ্ছে কিন্তু একটি কাজেও হাত দিচ্ছে না।

তাদের বাক্যবাণে বুকের ভেতরটা কেমন লাফাতে থাকে, মনে মনে বৃদ্ধা গ্র্যান্ডমা ডোনা ভাবে, এদের জন্যই জীবনের অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ সময় সে অবলীলায় হেসে হেসে পার করে দিয়েছে। কত সাধ কত আনন্দ দু'হাতে সরিয়ে তাদের লালন করেছে।

দু'মাস পেরোতেই মায়ের বিরুদ্ধে স্বামী ও ছেলে-মেয়ের অভিযোগে পলিনার কান যেন ঝালাপালা হওয়ার জোগার। একদিন সহ্য করতে না পেরে ভাইকে অনুরোধ করে, মাকে তার বাসায় নিয়ে যেতে। ভাই সব শুনে ইতস্তত করে উত্তর দেয়, জানিস তো, তোর বউদির কথা। মা যখন সব কাজ করতে পেরেছে তখনই তাকে সহ্য করতে পারেনি আর এখন তো শয্যাশায়ী।

পলিনা উত্তর দিল, তারপরও তোমাকেই রাখতে হবে দাদা। কারণ তুমি তার একমাত্র ছেলে। তাছাড়া মায়ের আশি বছর হয়ে গেছে। আর বাঁচবেনই বা ক'দিন। সলোমন এক ছুটির দিনে মাকে গাড়িতে করে নিয়ে এসে তার ঘরেই

ছবি: ইন্টারনেট

তুলে। মাও নিজের ঘরে এসে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলো। রাতে সলোমনের দুই মেয়ে কাজ থেকে ফিরে গ্র্যান্ডমাকে দেখে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। গ্র্যান্ডমার পরনে রঙধনু আঁকা ড্রেস, কোঁকড়ানো চুলে ব্যান্ড দেখে খুশীতে জড়িয়ে ধরলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তাদের মা ঘরে ঢুকতেই সবাই ভয়ে চুপসে গেল। শাশুড়িকে ফিরতে দেখেই যেন সলোমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার অবস্থা। সে চিৎকার করে বলে উঠলো, আমি কারো সেবা-টেবা করতে পারবো না। কে বলেছে নার্সিং হোম থেকে বের করে আনতে। সেখানে আর কারো মা থাকেনা? তারপর সবচেয়ে ঘৃণা ও কষ্ট মিশ্রিত কথা তুমি তোমার মাকে নিয়ে থাক। আমি চলে যাবো অন্যত্র।

এবার বড় মেয়ে ইভানা আর চুপ করে থাকতে পারলো না। সে মাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, চুপ কর মা। পঁচিশ বছর ধরে গ্যান্ডমা তোমাদের সাথে আছে। আমাদের জন্মেরও পাঁচ বছর আগে থেকে। আমাদের লালন-পালনে তোমার কতটুকু ভূমিকা বলতে পার? ছোট্ট বেলায় আমাদের বিছানা আলাদা করে দিয়েছে। বুকের দুধও কেড়ে নিয়েছ আমাদের মুখ থেকে। আজ পার্টি, কাল পিকনিক ইত্যাদি নিয়েই মেতে আছ সর্বক্ষণ। কিন্তু ভেবে দেখেছ একবার, গ্র্যান্ডমা তার বয়স্ক শরীরটা নিয়ে কতবার আমাদের জন্য বোতলে দুধ ভরেছে? কতবার ডায়াপার চেঞ্জ করেছে? কতবার নিজে সময়মতো না খেয়ে আমাদের খাইয়েছে? নিজের ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে হিচড়ে চুলোর ধারে দাঁড়িয়ে সবার জন্য রান্না করেছে? ছোট মেয়ে এবার বলে উঠলো, তুমি কাজের পরও সময় মতো বাসায় ফেরনি কখনো। এ দোকান, সে দোকান ঘুরেছ। আর আমরা চাতকের মত জানালার কাঁচ ধরে তাকিয়ে থেকেছি রাস্তার দিকে। বিশ বছর আগে যে মানুষটি বৈধব্যের যন্ত্রণা ভুলে আমাদের নিয়ে সুখে থাকতে চেয়েছে, সেই মানুষটিকে অসহায় পেয়ে কতই না অপমান তুমি করেছ মা। মেয়ে আরো বললো, সবকিছু আইন আদালত নিয়ে বিচার করা যায় না। মনের গভীরে স্থান দিতে হয় মানবতাকেও। আচরণেই প্রকাশ পায় মানুষের বংশের পরিচয়।

নাতনীদের কথা শুনে গ্র্যান্ডমার দু'চোখ আনন্দাশ্রুতে চিকচিক করে ওঠে। সে ভেবে পায় না নাতনীরা হঠাৎ করে মনে এত জোর কোথেকে পেলো? তবে কি তার জীবনটাই ওদের ভেতরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে? অসত্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শিখিয়েছে।

প্রায় ছয়মাস পর বড় নাতনী ইভানার হঠাৎ করেই বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সলোমনের স্ত্রী বায়না ধরে শাশুড়ীকে যেন ওল্ডহোম বা বৃদ্ধাশ্রমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। শুনে সবার মন ভীষণ

রকম খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু স্ত্রীর কটুবাক্যে দিশেহারা হয়ে সলোমন ও তার মেয়েরা গ্রান্ডমার জন্য উন্নতমানের একটি ওল্ডহোমের খোঁজ-খবর করতে থাকে।

অবশেষে খোঁজ পাওয়া যায় এক বৃদ্ধাশ্রমের। হোটেলের মত সুন্দর রুম, উন্নত খাবার দাবার, চিকিৎসার সার্বক্ষণিক সুযোগ সুবিধাসহ মাঝে মাঝে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া। ধর্মকর্ম করারও ব্যবস্থা আছে। আছে বিনোদনের আয়োজনও। কিন্তু প্রতিমাসে একটা বিরাট অংকের টাকা দিতে হয় এই নামী বৃদ্ধনিবাসে। দুই নাতনী বলেছে এই টাকাটা তারাই দেবে গ্র্যান্ডমার জন্য।

যথাসময়ে সলোমন ও তার মেয়েরা মাকে নিয়ে গেল বৃদ্ধাশ্রমে। মাকে রেখে ফিরে আসার সময় সলোমন ডুকরে কেঁদে উঠলো। সে শুধু মায়ের হাত দুটো ধরে বলতে পারলো, মাগো আমায় তুমি ক্ষমা করে দিও মা। নাতনীদের চোখের পানি ও গ্র্যান্ডমার চোখের পানি মিলেমিশে যেন একাকার হয়ে গেল। বাড়িতে এসে মায়ের ফাঁকা ঘরটি দেখে সলোমনের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যেতে লাগলো। বাড়ির সবার পায়ের চিহ্ন মুখস্ত ছিল মায়ের। যখনি যে কাজ থেকে ফিরে আসতো মা জিজ্ঞেস করতো, সলোমন এসেছিস? বৌমা এসেছ? কেটি ইভানা ভালমতো এসেছ সবাই? তারপর সে ঘুমাতো। আজ থেকে কেউ আর পায়ের শব্দ শোনার জন্য জেগে থাকবে না।

ওদিকে মাও যেন অনেককাল পরে নিপাট অবসরে নিজের মুখোমুখি নিজেকেই দাঁড় করালো। স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো কত কথা, কত সুখ-দুঃখ-বেদনার চালচিত্র। সেই ষাট বছর আগের কথা। আফ্রিকার অন্তবর্তী একটি দারিদ্র্য পীড়িত দেশ ইথিওপিয়ায় বেড়ে ওঠেছিলো সে। শৈশবকাল ও কৈশোরের কথা আজ কেন যেন বেশি বেশি মনে পড়ছে তার। জন্মের পর থেকেই বুঝতে পেরেছিল তার জন্মভূমিকে যেন মৃত্যু, ক্ষুধা দারিদ্র শত শত বছর ধরেই আকড়িয়ে রেখেছে। শিক্ষা ও চিকিৎসা করাতে তেমন কিছুই না। ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী দেশটির অগ্রযাত্রায় সর্বদা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদিন একদল আমেরিকান তাদের দেশে কয়েক মাসের জন্য ঘাঁটি গেড়েছিল।

কিছু শক্ত সামর্থ পরিশ্রমী লোক জোগাড় করতো। তারা আমেরিকান। তাদের টাকা আছে, শিক্ষা আছে। বুদ্ধি আছে কিন্তু রাস্তায় নেমে কাজ করার মত লেবার নেই। তাই ইথি ওপিয়ার কিছু কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ ও তাদের স্ত্রীদের লোভ দেখিয়ে ধরে নিয়ে এল। অনেক যুবক তাদের কথা জানতে পেরে ভয়ে অন্যত্র চলে গেল। কিন্তু তাদের বন্দী হয়ে গেল ফিলিপ ও ডোনা। বলতে গেলে ক্রীতদাস হিসেবেই তাদের আমেরিকায় আনা হলো। আমেরিকাতে পা দিয়ে তারা বুঝলো পরিশ্রম কাকে বলে। তাদের আফ্রিকা আজ অনুন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু পরিশ্রমেরও একটা সীমা থাকে। সদ্য বিবাহিত বর ফিলিপ ও ডোনা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের কারণে ভুলে গেল নিজেদের কথা। ভুলে গেল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কথ া। বিশ ঘন্টা খাটা-খাটুনীর পর তাদের যেন আর কোন হুঁশই থাকতো না । ফিলিপ কাজ করতো লোহা বানানোর ফ্যাক্টরীতে। দিন রাত অকথ্যভাবে তাকে লোহা টানতে হতো। আর ডোনা শপিং মলের বাথরুম পরিষ্কার ও ডাষ্টবিন পরিষ্কার করতো। বিনিময়ে পেতো সামান্য কিছু টাকা। বছরের পর বছর শ্রমের টাকা ঘুরিয়ে যখন একটু হাঁফ ছেড়ে বসলো তখন চিন্তা করলো কিভাবে গ্রীণকার্ড পাওয়া যায়। দশ বছর পর গ্রীণকার্ড পেলো বটে, তখন কোলজুড়ে এসেছে সলোমন ও পলিনা। সুতরাং ইথিওপিয়ায় আর ফিরে যাওয়া হয়নি। বাবা, মায়ের মৃত্যু সংবাদ জানতে হয়েছে চিঠি পড়ে।

এসময় বুক চিরে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ডোনা মরিসের। হায় আমার আফ্রিকা! হায় আমার জন্মভূমি! সংসারের দায়িত্ব পালন করতে দিয়ে আর দেখা হলো না তোমাকে আমার! এভাবে সাত-পাঁচ ভেবে ভেবেই দিন কাটে ডোনার।

হঠাৎ এক রাতে ওল্ড হোম থেকে একটি কল আসে। সলোমন ধরতেই ও পাশ থেকে এক মহিলা বলে উঠেন, আমি ওল্ড হোম থেকে নার্স ডরোথি বলছি। আপনার মা এই কিছুক্ষণ আগে মৃত্যুবরণ করেছেন। দয়া করে সবাই এক্ষুনি চলে আসুন।

সলোমনের গগনবিদারী মা-আ-আ চিৎকারে সবাই ঘুম থেকে উঠে ছুটে এল। বাবাকে বুকে জাপটে ধরে মেয়েরা গাড়ীতে স্টার্ট দিল। সলোমনের স্ত্রীও পিছন পিছন এসে গাড়ীতে উঠলো। আমেরিকা তখন শীতের দংশনে স্থবির। সবগাছগুলি কেমন যেন সর্বস্ব হারানো মানুষের মতো ন্যাড়া পাতাহীন দাঁড়িয়ে আছে। আজ কিছুতেই যেন রাস্তাটি ফুরাতে চাইছে না।

এক সময় সবাই ঢুকলো মায়ের রুমটিতে। ডোনাকে রাখা হয়েছে একটি মেডিকেল চিহ্ন সম্বলিত পোষাক পরিয়ে। সলোমন হুমড়ি খেয়ে মায়ের বুকে মাথা রেখে বলল, মা তুমি আমার ক্ষমা করে দিও মা। তোমার জন্য সন্তান হয়েও আমরা কিছুই করতে পারলাম না। এতক্ষণে পুত্রবধূ শাশুড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ডোনা যেন ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বলতে চাইছে, বৌমা আজ তুমি তো? তোমাকে জ্বালাবার মতো আর কেউ রইলো না। সুখে থেকো মা খুব সুখে। সলোমন ওল্ডহোমের পরিচালক বললো, মাকে নিতে পারবো কখন? পরিচালকের সাথে একজন ডাক্তার এলেন। তিনি বললেন, না সরি। এই বডি আপনারা নিতে পারবেন না। তিনি তার বডি লিখিতভাবে এক হাসপাতালে দান করে গেছেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই যেন বোবা হয়ে গেল। এমন সময় একজন নার্স এসে সলোমনের হাতে একটি চিঠি দিয়ে বললো, এই চিঠিটি আপনার মায়ের বালিশের নীচে পেয়েছি। আপনাকে লেখা।

সলোমন পাগলের মতো চিঠিটি খুলে পড়তে লাগলো। বাবা খুব তাড়াতাড়ি হয়তো চলে যাবো পরপারে। যাবার আগে তোমাকে কিছু কথা জানানো প্রয়োজন। আমি স্ট্রোক করে বোবা হয়ে যাইনি। বোবার অভিনয় করেছি মাত্র। ভেবেছিলাম যতদিন বাঁচবো বোবা হয়েই থাকবো । কারণ বোবার কোন শত্রু নেই। তারপর মনের কোণে একটু আশা ছিল দেখি অসুস্থ আমাকে কয়দিন তোমরা সহ্য করতে পার। ফল হাতে হাতে পেলাম। স্থান হলো বৃদ্ধনিবাসে। আমরা এতটা দুর্গম পথ পেরিয়ে এসেছি বলেই আজ তোমরা জন্মসূত্রে আমেরিকান। আমেরিকা তোমাদের কাছে স্বপ্নের দেশ কিন্তু আমাদের জন্য, বৃদ্ধাদের জন্য? অভিনয়টুকুর জন্য ক্ষমা করে দিও বাবা।

কাগজে কলমে আমার বডিটা দান করে গেলাম মেডিকেলকে। স্বইচ্ছায়, নৃ-তত্ত্ববিদ স্বজ্ঞানে। আমার দেহের ভেতর কিছুই আর ভাল নেই। রিসার্চ করে আবিষ্কার করতে পারে, আমার কোন হাড়টি কতটুকু কষ্ট জমে জমে লৌহ কঠিন পাহাড়ের রূপ নিয়েছে। কোন হাড়গুলো অপরিসীম শ্রমের কারণে ফাঁপা ঝুরঝুরে হয়ে গেছে। যদি সে নিরূপণ করতে পারে আফ্রিকার নারীসহ তাবৎ নারীদের সারাজীবনের কষ্টের পরিমাপ কত ইঞ্চি কত সেন্টিমিটার, তবে আমার আত্মা পরপারে গিয়েও শান্তি পাবে বাবা। পৃথিবীতে সব মা সব গ্র্যান্ডমা সব পুত্ররা এক রকম নয়। তবে আমাদের মতো মা সকল গ্র্যান্ডমাদের যদি মূল্যায়ন হয় তবে পৃথিবীর রূপরেখা একদিন বদলে যাবে এটা আমার বিশ্বাস। আমার দেশ আফ্রিকায় ক্ষুধা, দারিদ্র, মহামারির পাশাপাশি ভালাবাসার ফলগুধারা এখানে কতটুকু বহমান তা তো কমবেশি সবারই জানা। আজ রাখি বাবা সবাইকে নিয়ে সুখী হও। এখানে প্রাকৃতিক দুর্ভিক্ষ নেই বটে। দুর্ভিক্ষ শুধু ভালবাসার!

ইতি, মা।

সন্ধান

আবু নেসার শাহীন

ছবি: ইন্টারনেট

‘রোজ রোজ কোথায় যাও।’ সাজুর চোখে মুখে বিরক্তির চাপ। সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে পায়চারি করে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। গত রাতে এক ফোঁটাও ঘুম হয়নি।

‘তুমি যা ভাবছো আসলে তা না। আমি অনন্য’র কাছে যাই। কারণ...।’

‘কারণ তুমি এখনও অনন্যকে ভালবাস। এখনও তার সাথে ঘর করার স্বপ্ন দেখ। তোমার চরিত্র আমার জানা আছে।’ সাজু সিগারেট ধরায়। ধোঁয়ায় সারা ঘর ভরে যায়। পুষ্প ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সাজু চিৎকার করে, ‘তুমি যা করছো তা অন্যায়’।

সাজু দু’টো কাঁচের গ্লাস ভাঙ্গে। ওয়ারড্রপের উপর থাকা জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে। পুষ্প ছুটে এসে বলল, ‘তুমি ঠিক কি বোঝাতে যাচ্ছো?’

‘তুমি আর অনন্য’র কাছে যাবে না। তুমি শুধু আমার। আমার একার।’ সাজু পুষ্পকে জড়িয়ে ধরতে চায়। পুষ্প তাকে বাঁধা দিয়ে আবারও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় এবং পাশের ঘরে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, ‘আমার পক্ষে অনন্যকে ভুলে যাওয়া সম্ভব না। সাত বছর প্রেম করেছি। আমার ঘাড়ে এখনও তার নিঃশ্বাস পড়ে।’ পুষ্প কাঁদে।

সাজু এ শীতের মধ্যেও ঘামে। প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করে তার। বাথরুমে গিয়ে ঝরণা ছেড়ে ভিজে। রাতে জ্বর আসে। একটানা সাত দিন জ্বরে ভোগে। চোখের নিচে গাঢ় কালি পড়ে। মাথায় উস্কোখুস্কো চুল। মুখে কাঁচা পাকা দাঁড়ি। এ অবস্থায় একটা সিএনজি করে শেওড়াপাড়া চলে আসে। পুষ্পকে হাজার বার জিজ্ঞেস করেছে সাজু। অনন্য কোথায় থাকে? তার ঠিকানা কি? একবার শুধু বলেছে শেওড়াপাড়ায় থাকে। শেওড়াপাড়া অবশ্য বেশি বড় এলাকা না। নিশ্চয় অনন্যকে খুঁজে পাওয়া যাবে। অনন্যকে খুঁজে পেলে জিজ্ঞাস করবে, অনন্যর মধ্যে কি আছে? যা তার মধ্যে নেই। কেন পুষ্প আজও তার কাছে ছুটে আসে।

শেওড়াপাড়া বাজার রাস্তা ধরে কিছু দূর এগুলে তিন রাস্তার মোড়। মোড় জুড়ে বিশাল বট গাছ। বট গাছের শান বাঁধানো চত্বরে কিছু লোকজন বসে গল্প করছে। সাজু কাছে গিয়ে বলল, “অনন্যকে চিনেন?’

‘কোন অনন্য? গ্রামের বাড়ি কোথায়? আচ্ছা অনন্য দেখতে কেমন?’ একজন বৃদ্ধ লোক বলল।

‘উনি কি লম্বা না বেঁটে?’ আর একজন বলল।

‘অনন্য কি করে বলুন তো? চাকরি না ব্যবসা?’ একজন কিশোর ছেলে বলল।

এসব প্রশ্ন শুনে সে হকচকিয়ে যায়। নিজেকে এ মুহূর্তে অসহায় মনে হয়। আস্তে করে কেটে পড়ে। সত্যি তো অনন্য সম্পর্কে সে বেশি জানে না। পুষ্প তাকে কিছু বলতে চায় না। সে এলোমেলো ভাবে খোঁজা-খুঁজি করে। শরীর ক্লান্ত। রাতে বাসায় ফিরে পুষ্পর পাশে শুয়ে নিচু গলায় বলল, ‘অনন্যর কোন ছবি আছে?’

পুষ্প কোন কথা বলে না। সটান হয়ে শুয়ে পড়ে। গল্পের বই পড়ে। বেশ কিছুক্ষণ পর গল্পের বই বন্ধ করে কাত হয়ে শোয়। তারও কিছুক্ষণ পর নাক ডাকে। সাজু দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হাল ছাড়লে চলবে না। যে করেই হোক অনন্যকে খুঁজে বের করতে হবে। বিছানা ছেড়ে ওঠে। ড্রইং রুমে এসে টিভি ছেড়ে সিনেমা দেখে। সিগারেট ফুঁকে। রাতে এক ফোটাও ঘুম হয় না। সকালের দিকে গাঢ় ঘুম আসে। আর ঘুমের ভেতর অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখে রোজ।

একদিন পর আবারও শেওড়াপাড়া আসে। একটা বাড়িতে ঢোকে সাহস করে। দশ তলা বিল্ডিং। প্রতিটা ফ্ল্যাটের দরজায় টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করে। নিচে নেমে গেইটে চক দিয়ে দাগ কাটে। বেশ কয়েকটা বিল্ডিংএ ওঠানামা করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একটা টিনশেড বাড়িতে ঢুকে দরজায় টোকা দিতেই একটা দশ বার বছরের ছেলে বের হয়। সে মুচকি হেসে বলল, ‘এখানে অনন্য থাকে?’

‘হ্যাঁ থাকে। কেন অনন্যকে আপনার কি দরকার?’

‘আমি ওর সাথে একটু কথা বলতে চাই। প্লিজ ওকে একটু ডেকে দাও।’

‘কি মুশকিল! ডাকলে সে আসবে?’ ছেলেটির চোখে মুখে বিস্ময়। এক দৃষ্টে সাজুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

‘ডাকলে আসবে না কেন?’ সে ভয়ে ভয়ে বলল।

‘ওর বয়স মাত্র এক বছর। আচ্ছা আপনি কে বলুন তো?’

সে আর কথা বাড়াল না। উল্টো দিকে ঘুরে হাঁটতে থাকে। একটানা হেঁটে বাসায় ফিরে রাতে খাবার খেয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। হঠাৎ বসের ফোন আসে, ‘কি ব্যাপার সাজু? আজ প্রায় দশ দিন হতে চলল তুমি অফিসে

আসছো না, আমি জানি চাকরির টাকায় তোমার সংসার চলে। অথচ....।'

'স্যার আমি কাল থেকে নিয়মিত অফিস করবো। টানা সাত দিন জ্বর ছিল। তাই...।'

'ওকে ওকে। বিকেলে বোর্ড মিটিং আছে। তোমার উপরে ভরসা আমার একটু বেশি।'

'থ্যাংক ইউ স্যার।' লাইন কেটে যায়।

সে সিগারেট ধরায়। গ্রীন রোডের সতের তলা বিল্ডিং এর টপ ফ্লোরে থাকে সে। এখান থেকে অনেক দুর পর্যন্ত দেখা যায়। সে ভাবে অনন্যকে খুঁজে বের করতে না পারলে তার সংসারটা ভেসে যাবে। কি রকম একটা অদ্ভুত সমস্যায় পড়েছে সে। স্ত্রী সংসার করে তার সাথে অথচ অনন্যর সাথে মোবাইলে কথা বলে দরজা জানালা বন্ধ করে। ঘন্টার পর ঘন্টা কথা চলে। পুষ্প আর অনন্যর মধ্যে কত ভাব-ভালোবাসা, কত মান-অভিমান, কত ঝগড়া-বিবাদ। এসব শুনতে শুনতে এক সময় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সে। অনন্যকে খুঁজে বের করে হাত জোর বলবে, অনন্য তুমি পুষ্পের জীবন থেকে সরে যাও। দেখ অল্প কয়েক বছর আমরা বাঁচি। এত অশান্তি কার ভালো লাগে বলো?

বোর্ড মিটিং হলো না। সে অফিস শেষে মতিঝিল থেকে বাসে চেপে শেওড়াপাড়া বাস স্ট্যান্ডে এসে নামে। সন্ধ্যে হতে এখনও বেশ সময় আছে। রিক্সা চেপে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরে। তারপর কালভার্ট এ নেমে এক বৃদ্ধ লোককে জিজ্ঞেস করে, 'চাচা অনন্য নামে কাউকে চিনেন?'

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'অনন্য তো আজ বাইশ বছর হতে চলল আমেরিকায় থাকে। এক বিদেশী মেম বিয়ে করেছে ও। মাঝে মাঝে ফোন করে। মন চাইলে টাকা পয়সাও দেয়। এ আর কি। তা বাবা তুমি হঠাৎ অনন্যর খোঁজ করছো? '

-না মানে এমনি। সে সামনে এগুতে থাকে। রাস্তায় প্রচুর ধুলো। কয়েকটা বাসায় খোঁজ করে চকের দাগ কাটে। বেশ রাত করে বাড়ি ফিরে। নিজের মত করে খেয়ে ঘুমিয়ে পরে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। সকালে অফিসে যাওয়ার জন্য বের হতে যাবে এমন সময় পুষ্প বলল, কী অনন্যর খোঁজ পেলে?

- ইয়ার্কি মারছ না। সাজু রেগে গজ গজ করতে থাকে।

- এ জীবনে তুমি আর অনন্যর খোঁজ পাবে না।

- শেওড়াপাড়া থাকলে অবশ্যই পাবো। সে ছুটে বেরিয়ে যায়।

- বললামতো পাবে না, পুষ্প চেঁচিয়ে বলল।

ফার্মগেট বাস স্ট্যান্ডে এসে মতিঝিলের বাস ধরে। বাসে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে থাকে। জ্যাম ঠেলে ঠেলে বাস সামনের দিকে এগুতে থাকে। হঠাৎ কে যেন বলে উঠে, ' না না ভাই অনন্য মোটেও কাজটা ভালো করছে না। এভাবে একটা মেয়েকে ঠকানো ঠিক হচ্ছে না তার। তাছাড়া মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে।'

সাজু লোকটার কাছে এসে বলল, ভাই অনন্যর ঠিকানাটা একটু দেন। অনন্য যে মেয়েটাকে ঠকাচ্ছে সে আমার স্ত্রী। অনন্য যে কোন সময় আমার স্ত্রীকে ফোন করে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে। তার জন্য আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার সময়টা ভালো যাচ্ছে না। আমাদের বিবাহিত জীবন মোটেও সুখের না। গত কয়েকটা দিন ধরে আমি হন্যে হয়ে অনন্যর খোঁজ করছি। প্লিজ অনন্যর ঠিকানাটা দেন।

-অনন্যকে আপনি কোথায় কোথায় খোঁজ করেছেন? লোকটা বলল।

- শেওড়াপাড়ার অর্ধেকটা খোঁজ করেছি।

- কিন্ত আমার বন্ধু অনন্য জার্মানিতে থাকে আর মেয়েটা থাকে ঢাকার বংশালে। আপনি তাকে শেওড়াপাড়া খুঁজলে পাবেন? তাকে খুঁজতে হলে জার্মানীতে যান।' লোকটার কথা শুনে সবাই হাসাহাসি করে। পরস্পর কথা বলে। সে বিব্রত বোধ করে। এক পর্যায়ে সে কারওয়ান বাজার স্টপেজে নেমে আবার মতিঝিলের বাস ধরে। ধীরে ধীরে শীত বাড়ছে। গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। চারদিকে কেমন যেন গোমট ভাব। সূর্যের দেখা যাচ্ছে না।

বোর্ড মিটিং সেরে ফিরতে ফিরতে রাত হয়। খাওয়ার টেবিলে পুষ্পের মুখোমুখি বসে খেতে খেতে এক পর্যায়ে বলল, আচ্ছা পুষ্প তোমার কাছে অনন্যর ছবি আছে?

- উহুঁ নেই। পুষ্প মুচ্‌কি হাসে।

- সত্যি বলছো?

- হুঁ সত্যি বলছি। কেন ছবি দিয়ে কি করবে? পত্রিকায় নিখোঁজ সংবাদ বিজ্ঞাপন দিবে?

- না। সে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে। পুষ্প কিছুতেই তাকে অনন্যর খোঁজ দিবে না। রাতে ঘুমের ভিতর অদ্ভূত সব স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠে। বাথরুমে ঢুকে ঝর্ণা ছেড়ে ভিজে। পুষ্প তখন গভীর ঘুমে। ড্রইং রুমে এসে ইন্টারকমে নীচ তলায় গার্ডকে ফোন করে, আচ্ছা বদিউল আমি যখন বাইরে যাই তখন কি আমাদের কোন গেষ্ট আসে? না মানে ম্যাডামের গেষ্ট?

- না স্যার। তবে ম্যাডাম প্রতিদিন কোথায় যেন যান। দুই তিন ঘন্টা পর আবার ফিরে আসেন।

ঠিক আছে। সে বেডরুমে এসে পুষ্পের মোবাইল হাতে নেয়। আজ পুষ্প কার কার সাথে কথা বলেছে। একটা নম্বরে পুষ্প এক ঘন্টা কথা বলেছে। সে ঐ নাম্বারে ফোন দেয়। রিং হচ্ছে। সে খুব উৎফুল্ল। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা অনুভব করে। এ বুঝি অনন্যর গলা শুনতে পাবে। কিন্ত না রিং হতে হতে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে ঘন্টা খানেক চেষ্টা করার পর হাফিয়ে ওঠে।

পরদিন অফিসে গিয়ে এক ফাঁকে কাষ্টমার কেয়ারে যায়। নম্বর চেক করে দেখে পুষ্পের নামে রেজিস্টেশন করা। ঠিকানাও তার। অদ্ভুত ব্যাপার! সে হতাশ হয়ে পড়ে। অফিসে ঢুকতেই পিয়ন বলল, স্যার আপনাকে ডাকে।

সে বসের রুমে ঢুকতেই বস বলল, কি সাজু আহমদ খবর কি?

- জ্বী স্যার ভাল। সে চেয়ার টেনে বসে।

কিছু দিন ধরে দেখছি তুমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে থাকো। অফিসের কাজে তোমার কোন মনোযোগ নেই। কি হয়েছে বলতো?

না স্যার কিছু না। তার গলা জড়িয়ে আসে।

ঠিক আছে তুমি যাও। তেমন কোন সমস্যা হলে শেয়ার করতে পারো। বস কাজে মনোযোগ দেয়। সে ওঠে আসে। পুষ্পকে ফোন করে পাঁচটার ভিতর শাহবাগ আসতে বলে। অফিস শেষে হেঁটে শাহবাগ আসে। পুষ্পকে নিয়ে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের চেম্বারে যায়। পুষ্প অনন্য সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য দেয় না। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ একজন মধ্যবয়সী মহিলা। সব শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমি কিছু ঔষধ লিখে দিচ্ছি। মাস খানেক পর আবার আসবেন। আর সাজু আহমেদ বউকে একটু বেশি বেশি সময় দিন। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে কোথাও থেকে ঘুরে আসুন।

দেশ বিদেশ অনেক ঘুরেছি। কিন্ত কোন কাজ হয়নি।

ঠিক আছে আজ আপনারা যান। এক মাস পর আবার আসবেন।

রাতে চাইনিজ খেয়ে বাসায় ফিরে দু'জন। পুষ্প ঔষধ খেয়ে ঘুমিয়ে পরে। সকালে হাজার ডাকেও পুষ্পের ঘুম ভাঙ্গে না। সে নিজের মত

করে নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। ছুটির দিন। শেওড়াপাড়া এসে একটা টি স্টলে চা খায়। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরাঘুরি করে। বিশাল বিশাল হাউজিং বিল্ডিং গড়ে ওঠেছে। একটা একটা করে বিল্ডিং এ ঢুকে অনন্যর খোঁজ নেয়। এভাবে কখন যে সময় কেটে যায় সে টের ও পায় না। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে দেখে বেড রুমের দরজা বন্ধ। পুষ্প মোবাইলে কথা বলছে। পুষ্প বলছে, না না অনন্য তুমি সাজুকে ভুল বুঝছো। সাজু খুব ভালো। ও আমার আর তোমার সম্পর্কে সব জানে। তবু আমাকে ডিভোর্স দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছে না। আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসে ও। তবে কি জানো অনন্য তোমার শূন্যতা কেউ পূরণ করতে পারবে না। কেউ না।

সাজু দরজা ধাক্কাতে থাকে। পুষ্প দরজা খোলে না। চুপচাপ বসে থাকে। সাজু দরজা ধাক্কাতেই থাকে। অনেকক্ষণ পর দরজা খোলে পুষ্প। তার দুই হাতে দুইটা মোবাইল। সাজু পুষ্পর মোবাইল দুইটা নিয়ে দেখে পুষ্প এক মোবাইল থেকে আরেক মোবাইলে রিং দিয়ে কথা বলছিল। সাজু দু'চোখ কপালে তুলে বলল, তাহলে এই?

পুষ্প কাঁদে। সাজু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুমি তাহলে নিজের সাথে নিজে কথা বল? পুষ্প হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে, ও কলেজে আমার এক বছরের সিনিয়র ছিল। সাত বছর প্রেম করার পর পারিবারিকভাবে আমাদের বিয়ে ঠিক হয়। বিয়ের ঠিক আগের দিন অনন্য আমাকে নিয়ে মোটরসাইকেলে চেপে ঘুরতে বের হয়। আমরা যখন তিনশ ফিটে তখন দমকা বাতাসের সাথে বৃষ্টি নামে। সামনের কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না দু'জন। এদিকে অনন্য ও মোটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল। আমি অবশ্য বার বার নিষেধ করেছিলাম তাকে। অনন্য আমার কথা শুনেনি। একটা থেমে থাকা প্রাইভেট কারের সাথে ধাক্কা খেয়ে দুইজন দুই দিকে ছিটকে পড়ি। তারপর আর কিছুই মনে নেই। মানে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। চারদিন পর জ্ঞান ফিরে আমার। জ্ঞান ফেরার পর শুনি অনন্য আর বেঁচে নেই।

সত্যি অনন্য বেঁচে নেই? সাজু শূন্যে লাফিয়ে ওঠে।

তো আর বলছি কি। সব যখন শেষ তখন আমার আর বেঁচে থেকে কি লাভ। বেশ কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেও সফল হলাম না। এক সময় ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকতাম। এই ভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর আমার দুই মোবাইলে দুইটা সিম ভরে নিজের সাথে নিজে কথা বলি। মনে মনে ভাবি এক পাশে অনন্য আর এক পাশে আমি। পরিবারের সবাই আমাকে নিয়ে ভাবে। কেউ বলে রিহেভ এ দিতে, কেউ বলে পাগলা গারদে দিতে, কেউ বলে বিয়ে দিতে...।

বুঝলাম তারপর এক পর্যায়ে তোমার সাথে আমার বিয়ে হয়।

হ্যাঁ।

তুমি প্রায় রোজ শেওড়াপাড়া যাও কেন?

অনন্যর বাড়ি শেওড়াপাড়ায়। ঐখানে তাদের পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। রোজ একবার গিয়ে কবর দেখে আসি।

এতোক্ষণে পুরো ব্যাপারটা বুঝলাম। শোন পুষ্প তুমি নিজের সাথে নিজে যত খুশি কথা বল, আমার কোন আপত্তি নেই।

কেন? আপত্তি নেই কেন? পুষ্প খুব অবাক হয়।

সে তুমি বুঝবে না। এখন রেডি হও। একটা প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে সিলেট যাবো। রোববার দিন সকালে ফিরে অফিস করবো। যাও যাও রেডি হও। পুষ্প চোখ মুছে। কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিয়ে সাজগোজ করে॥

এক পশলা বৃষ্টি

(১২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পড়ছে টপ্ টপ্ করে। নিরবে দু'জনে হাঁটছি। হাটছি দু'জনে অন্ধকার আকাশ আর বৃষ্টিকে স্বাক্ষী রেখে। আর মেয়েটি হঠাৎ করেই আমার ডান হাত ধরে তার ছাতার তলে আমাকে একপ্রকার টেনেই নিয়ে নিল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। একি সম্ভব এই প্রকাশ্য রাস্তায়? যারা আমাকে চেনে, চেনে না বা আশপাশের চেনা-জানা লোকেরা কি ভাববে? ইতস্ততঃ করতে দেখে সে বললে-

বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছ যে তুমি। সর্দি লেগে যেতে পারে। ছাতা আনোনি কেন?

তার মৃদু অনুযোগ শুনে মনে হলো আমরা পরস্পর যেন বহুদিনের পরিচিত। মনের আবেগ, অনুভূতি যেখানে হারিয়ে যায় এক লহমায় কোন সুদূরে।

লোকে যে যাই বলুক এই মুহূর্তে একজন সুন্দরী নারীর সাহচর্য আমাকে বেশ আনন্দ দিচ্ছে! এই বাস্তবতাকে ভুলি কি করে? তার সাহসের তারিফ না করে পারলাম না। বললুম-

এই মুহূর্তে কেউ যদি দেখে ফেলে? তখন?

আমার বয়েই গেল?

কিন্তু... কিন্তু...

আমি সে রকম মেয়েই নই যে, একেবারে নার্ভাস হয়ে যাবো। কেউ যদি প্রশ্ন তুলে- তবে বলব, একজন বোন তার ভাইকে সাহায্য করছে মাত্র! আমি কথা না বাড়িয়ে তার ছাতার তলে থেকে হাঁটছি। আর ভাবছি- মেয়েটি তো আচ্ছা হে? এতো সাহস থাকাটা ভাল নয়। বিপদ ডেকে আনে। আর এর ফাঁকে তার দিকে আড় চোখে তাকালাম- আবছা আলোয় লক্ষ্য করলাম- বৃষ্টির ছটায় তার পড়নের কামিজ শরীরটায় লেপ্টে গেছে। আমার শরীর তার উষ্ণ শরীরে লেগে যাচ্ছে আর সেই উষ্ণতা এক মিশ্র অনুভূতি আমায় দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। ভিজে ভিজে দু'জনে একাকার হয়ে গেলাম। কোনরকম ভিজা শরীরেই পৌঁছে গেলাম ভাড়া বাসায়। কিন্তু সে আমাকে পৌঁছে দিয়েই হন্ হন্ করে চলে যাচ্ছিল।

সৌজন্যতা হেতু তাকে আহ্বান করলাম বাসায় বসে যেতে। কিন্তু সে তা নাকচ করে দিলো। বললে-

আর একদিন বসবো দাদা।

কিন্তু তোমাকে তো ধন্যবাদ দেয়া হলো না। নামটাও জানা হলো না।

না না দাদা। এ এমন কি করলাম। আমি নিক্কি। নিকসেংআ।

এই বলেই সে তার দিদির বাসায় চলে গেল। আমি ভাবলাম- হয়তো সে আমাকে পূর্বে দেখেছে বা তার দিদির বাসাটা সে চেনে। কিন্তু তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। নয়তো সে এমনভাবে হন্ হন্ করে চলে যাবে কেন? আমার ধারণা হয়তো ভুলও হতে পারে! আবার সত্যও হতে পারে। তবুও আমি তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আজকের এই এক পশলা বৃষ্টির সৌজন্যে পাওয়া এক অষ্টাদশী মেয়ের ক্ষণিকের সাহচর্য অন্তরে অনুভব করে আবার মনের আয়নায় কল্পনা করতে লাগলাম আর মনে মনে বললাম- ধন্য তোমার সাহচর্য, ধন্য তোমার ইচ্ছা আর ধন্য তোমার দুঃসাহস! তুমি দীর্ঘজীবি হও। পৃথিবী যতদিন র'বে, রবিবারও থাকবে; সেই মিষ্টি-মধুর ঘন্টাও বাজবে আমার অন্তরে, ক্ষণে ক্ষণে; আমিও হয়তো তার সাথে থাকব আজীবন। হয়তো জাগতিকের জন্য নয়, হয়তো ঐশলোকের জন্য॥

সার্থক বড়দিন

জ্যাকুলীন সুইটি গমেজ

ছবি: লিটন আরিন্দা

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ এখন শুধু অফুরন্ত ছুটি ও রেজাল্টের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। এক সপ্তাহ পরে বড়দিন চারদিকে চলছে বড়দিনের প্রস্তুতি, তাই আজ দেরী করেই ঘুম থেকে উঠেছে বন্যা। হঠাৎ মায়ের উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর কানে যেতেই অবাক হলো, কি ব্যাপার কার সাথে এ রকম স্বরে কথা বলছে মা! বাড়ীতে বন্যা, ভাই প্রত্যয় ও কাজের বুয়া শান্তির মা ছাড়া তো আর কেউ নেই। ঘর ছেড়ে বেরোতেই বুঝতে পারল শান্তির মাকে বকছে মা।

মা বলছে, "এসেছে কদিন হয় আর এখনি বড়দিন করার শখ জেগেছে। যেতে চাও তো যাও, একবারের মতই যাও। বাড়ির কর্তা আসবেন কত কাজ এখন এ যাবে বাড়িতে।"

শান্তির মা রান্না ঘরের এক কোনায় বসে কাঁদছে। মায়ের কথা শুনে বুঝতে পারল কি হয়েছে। শান্তির মা ৫ মাস হলো ওদের বাড়িতে কাজ করছে। মালা পিসী গ্রাম থেকে ওকে জোগাড় করে এনেছিল। তার ৫ বছরের এক মেয়ে শান্তি গ্রামে তার মায়ের কাছে থাকে। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে আর টাকার জন্য ঢাকায় কাজে এসেছে। হয়তো মেয়ের সাথে বড়দিন করতে যেতে চায়। কয়েকদিন আগে রাতের বেলা পানি খেতে রান্নাঘরে এসে দেখছিল শান্তির মা জেগে জেগে মেয়ের ছবি দেখছে, হঠাৎ বন্যাকে দেখে বলল, 'দেখ দিদি আমার মাইয়ার ছবি।

বন্যাকে মা দেখতে পেয়ে বলল, "কি ব্যাপার, হাঁ করে কি দেখছিস, মুখ ধুয়ে নাস্তা খেয়ে আমাকে উদ্ধার কর।" তারপর শান্তির মার উদ্দেশে বলল, "যাও আর নাকি কান্না কাঁদতে হবে না রান্নাঘরে গিয়ে কাজে হাত দাও গিয়ে।" বলে গট গট করে হেঁটে লিভিং রুমে চলে গেলো মা।

বন্যা মুখ ধুয়ে ডাইনিং টেবিলে এসে দেখল পরোটা ও আলু ভাজি তৈরি করাই আছে। গত ৫ মাস আগেও মায়ের এই সকালের নাস্তা তৈরী করতে হিমসিম খেতে হতো। নাস্তা তৈরি করে আবার দুই ভাই-বোনকে স্কুলে দিয়ে ফিরে এসে ঘরের কাজ শেষ করতে হতো। ১ জন ছুটা কাজের বুয়া শুধু সকালে থালাবাসন মেজে আর কাপড় ধোয়ার কাজ করেই চলে যেত। মা আবার সেনা সংঘের প্রেসিডেন্ট, তাই ১১টার দিকে তাকে আবার বেরিয়ে যেতে হতো গরীব মহিলাদের হাতের কাজের প্রশিক্ষণ দিতে। শান্তির মা আসার পর কোন কাজেই তাকে হাত দিতে হয় না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সব কাজ সেরেও সে কেন যে মায়ের মন পায় না। এইসব প্রশ্ন ১৩ বছরে বন্যার মাথার ভেতর পাক খেতে থাকে। কোন খাওয়াই ওর মুখে রুচিতে যায় না। খাওয়া রেখে আস্তে আস্তে রান্না ঘরে এসে দেখে শান্তির মা থালা-বাসন ধোয়ার কাজে লেগে গেছে। আর রান্না ঘরের কোনার দিকে একজন অপরিচিত রুগ্ন ছেলে বসে আছে। এত শীতের মাঝেও ছেলেটির গায়ে মাত্র একটি মলিন ফুলশার্ট। বন্যা কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, "তুমি কে?

"আমার ছোটভাই" শান্তির মাই কান্নাজড়িত স্বরে উত্তর দিল।" আমারে নিতে আইছে বড়দিন করার লিগা"। আর কিছুই বলতে পারল না সে, আবারো চোখ দিয়ে অশ্রু ঝড়তে লাগলো তার। বন্যার দেখে মনে হলো তারা কেউই সকালে কিছুই খায়নি।

বন্যা লিভিংরুমে গিয়ে দেখল মা ও প্রণয় জিটিভি দেখছে। "মা তুমি বুয়াকে যেতে দিচ্ছ না কেন, বড়দিনের সব পিঠা তো বানানো শেষ। বড়দিন করে আবার এসে পড়বে। মেয়ের সাথে বড়দিনে করতে চেয়েছে, যেতে দাওনা মা?" বন্যা সুধায়।

মা টিভি থেকে চোখ সরিয়ে ভস্ম করা দৃষ্টিতে বন্যার দিকে চেয়ে বলল, "এতই যদি বুঝতে পারতে তাহলে আর এই প্রশ্ন করতে না। জান না কতদিন পরে তোমার বাবা এবার দেশে বড়দিন করতে আসছে।

বাড়িতে কত মানুষের ঝামেলা হবে এগুলো কে সামলাবে।"

তারপরে কথা ঘুরিয়ে বলে, "আজকে বিকেলে আমাদের এখানে বড়দিনের মিটিং হবে, তাই যা করার তাড়াতাড়ি এক্ষুণি করে নাও, যাও।"

বন্যা আর কথা বাড়ায় না, শুধু অবাক হয়ে মাকে দেখে আর চিন্তা করে গত বছরও বড়দিনে কোন বুয়া ছিল না। বড়দিনের সব পিঠা মা একই বানিয়েছিল। আগের ছটা বুয়াকে এর চেয়ে বেশি বেতন দিয়েও এ কাজ কখনো মা করাতে পারেনি। আসলে সব মানুষই শক্তের ভক্ত নরমের যম। হঠাৎ বাবার কথা শুনে খুব আনন্দ হলো। কাল বাদে পরশু বাবা এবার বড়দিন করতে আসছে। ঠিক দু'বছর পর বাবা এবার ওদের সাথে বড়দিন করতে আসছে। গত বছর অনেক বলেও বস তাদের ছুটি দেয়নি। তাই সবারই মন খারাপ ছিল কতদিন ধরে বাবাকে দেখে না বন্যা, হঠাৎ বাবার ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো, তাহলে বাবার বসও কি মায়ের মত বাবাকে ছুটি দিতে চায় না? এই সব প্রশ্ন আবার বন্যাকে ভাবুক বানিয়ে ফেলল।

বিকেলে মায়েদের সেনাসংঘের মিটিং এর সব সদস্যারা এসেছে বন্যাদের বাড়ীতে। সবাই ওদের আশে পাশেই থাকে। প্রথমেই তারা তাদের প্রথা অনুযায়ী কিছুক্ষণ প্রার্থনা সেরে তারপর মিটিং শুরু করল। মিটিং চলার সময়ে তাদের চা পর্ব চলতেছিল। শান্তির মার সাথে বন্যাও সাহায্য করতে থাকে। বন্যা জানে আজকে মিটিং এ তারা বড়দিন উপলক্ষে কি কি করবে তাই আলোচনা করবে। প্রেসিডেন্ট মা সবার আগে বক্তব্য রাখছেন, "শোন বোনেরা প্রতিবারের মত এবারো আমরা আমাদের সবার জমিয়ে রাখা পুরোনো কাপড় গরীবদের মাঝে বিতরণ করব। আর আজকে যে চাঁদা উঠানো হবে তা আমরা ফাদারকে দেব বড়দিনের জন্য গরীবদের খাবার কেনার জন্য। আর আমাদের হাতের কাজের স্কুলের অসহায় মহিলাদের আগামীকাল তাদের পারিশ্রমিক ও বড়দিন করার জন্য অতিরিক্ত টাকা বিতরণ করা হবে।"

বন্যা জানে, এই হাতের কাজের স্কুল তৈরিতে মায়ের অবদানই বেশি। অনেক কাঠ কয়লা পোড়াতে হয়েছে এই স্কুল তৈরি করার পেছনে। ওখানকার সব মহিলারাই কোন না কোনভাবে অত্যাচারিত। মায়ের আরও কিছু জ্বালাময়ী বক্তৃতা বন্যার মনকে নাড়া দিয়ে উঠল। কিশোরী বন্যার মাথায় চিন্তার ঝড় উঠল, তার নিজের ঘরেই তো একজন অসহায় মহিলা রয়েছে তা কি মা একটুও বুঝতে পারছে না। মায়ের বক্তব্য শেষ হওয়ার পরে চায়ের সাথে তারা তাদের সাংসারিক আলোচনা করতে লাগল। বন্যা জানে তাদের এই মিটিংএ দশ ভাগ দরকারী কথার মাঝে আটভাগই হয় সাংসারিক প্যাচাল না হয় পরচর্চা। মা বলছেন, "বন্যার বাবাকে তো বড়দিনে ছুটি দিতে চায় না। বসটা যা বদমাস। এবার তো দুবছর পর ছুটি দিল বড়দিনের জন্য। আমিতো বলেই দিয়েছি এরকম করলে ওখানে বাদ দিয়ে অন্য জায়গায় কাজ খোঁজ। কাজ জানলে আবার কাজের অভাব হয় নাকি।"

বন্যা এবার আর থাকতে না পেরে মায়ের কথার মাঝেই বলে উঠল, "মা বাবার বসের মত তুমিও তো শান্তির মাকে বড়দিন করতে যেতে দিচ্ছ না, তাহলে শান্তির মাও যদি আমাদের এখানে কাজ বাদ দিয়ে অন্য জায়গায় চলে যায় তখন কেমন হবে?" বন্যার আকস্মিক প্রশ্ন শুনে বন্যার মা সহ ঘরের সবাই হতবাক হয়ে বন্যার দিকে চেয়ে থাকে। বন্যার প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে মিটিং এর পরিবেশ একটু অন্যরকম হয়ে যায়। মার পরিবর্তে সুমিতা আন্টিই বলল, "মা বন্যা সব প্রশ্নের উত্তর ছোটদের জানতে হয় না।" বন্যা আর ওখানে থাকতে পারল না নিজের ঘরে চলে গেল॥

সবাই চলে যাওয়ার পর সেদিন রাতে মায়ের সাথে বন্যার আর কোন কথাই হয় না। মা যেন হঠাৎ থম মেরে গেছে। রাতেও ভালোমত ঘুম হলো না বন্যার। সারাক্ষণ ওর মনে হচ্ছিল কিছু একটা অপরাধ করে ফেলেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বের হলো বাড়ির পরিবেশ বোঝার জন্য। রান্নাঘরে হালকা কথার আওয়াজ পেয়ে বন্যা গিয়ে দেখল শান্তির মা মাকে বলছে, "মাসি, আমি আপনারে কষ্ট দিমু না, বড়দিন কইরাই আইস্যা পড়ুম।"

মা শান্ত স্বরে বলছেন, "এক সপ্তাহই আমার তেমন কষ্ট হবে না। বন্যা তো আছেই। তুমি পড়শু সকাল সকাল চলে যাও আর সুন্দরমত মা ও মেয়ের সাথে বড়দিন করে এসো। হঠাৎ মায়ের এই পরিবর্তন দেখে বন্যা অবাক হয়ে যায় আবার নিজের প্রতি একটু অপরাধ বোধও হতে থাকে বেশ অবাক লাগছিল মা ওকে এই পর্যন্ত একটুও বকা দেয়নি দেখে।

আজ ২৪ ডিসেম্বর, রাতে গির্জায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ঘরের সবাই। এর মধ্যে বাবাও এসে পড়েছেন এবং বুয়াও গ্রামে বড়দিন করতে চলে গেছে। বাবা আসার আনন্দে সব কিছু ভুলে ছিল সে। কিন্তু গির্জায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং এই মুহূর্তে যেন খারাপ লাগা ভাবটা আবার জেগে উঠল। মায়ের জন্য ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। আর থাকতে না পেরে সঙ্গে সঙ্গে মায়ের ঘরের দিকে চলে গেল ও। বাবা ও মায়ের কাপড় পড়া শেষ। মা আয়না দেখছিল। হঠাৎ এক ঝটকায় বন্যা ঘরে ঢুকে মাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল বলল, "মা, আমি সত্যিই দুঃখিত তোমাকে কষ্ট দিয়েছি বলে, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

মা বেশ অবাক হয়ে গেলেন। ব্যাপার বুঝে নিয়ে বললেন, "মা বন্যা, তোমার উপর আমি রাগ করিনি শুধু তোমার সাহস ও চিন্তাধারা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার ভাষা আমার জনা ছিল না, তাই তোমার সাথে এতদিন আমি ঔ ব্যাপারে কোন কথা বলিনি। কিন্তু এটাই বাস্তব, সব মানুষই নিজের সমস্যা বড় করে দেখে কিন্তু নিজের ক্ষেত্রেও যে সে সমস্যা অপরের জন্য সৃষ্টি করছে সেটা কেউ খেয়াল করে না। তুমি আমার সেই চোখের পর্দা সরিয়ে দিয়েছো। তবে সব সময় স্মরণ রাখবে তুমি তোমার নিজের এই বোঝার ভাবনা ও সত্য বলার সাহস কখনও হারিয়ে ফেল না যেন।" এই বলে মাও ওকে জড়িয়ে ধরলেন।

বাবা এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিলেন, এবার তিনি বন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে বরলেন, "মা বন্যা, এবারের বড়দিনই হবে তোমাদের জন্য সার্থক বড়দিন। মনে রাখবে শুধু মানুষকে বড়দিনে দান করলে আর উপহার দিলেই বড়দিন হয় না, মানুষকে ভালবেসে নিজে ত্যাগ স্বীকার করে অন্যকে আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ দিলেও কিন্তু বড়দিন হয়।

হঠাৎ রাতের নৈশব্দতাকে ছিন্ন করে দূর হতে ঠং ঠং করে গির্জার ঘন্টাধ্বনি বেজে উঠল॥

কলাম

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

ঢাকার এক বিস্মৃত বইয়ের দোকান

ঢাকা ও কোলকাতার রেল স্টেশনে ছিল একটি বইয়ের দোকান, এখন সেটা বিস্মৃত। ঢাকার ফুলবাড়িয়া ও কোলকাতার হাওরা রেল স্টেশনে দুইলার বুকস্টল উন্নিশ শতকের প্রধান আকর্ষণ ছিল। বড় বড় জংশনে, পড়ুয়াদের সময় কাটতো দুইলারের বইয়ের পাতা উল্টায়িয়ে। এমিল মোরো নামে এক ইংরেজ সাহেব তার বাড়ির বিশাল আলমারির বই নিয়ে, এলাহাবাদ জংশনে আসতেন বই বিক্রি করতে। বৃটিশ ভারতীয় রেলের সঙ্গে মি. মরোর নামটা চিরকালের জন্য জড়িয়ে গিয়েছিল। ঢাকা, চট্টগ্রামসহ সব রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে গড়ে উঠে "এ এইচ দুইলার কোম্পানি" নামের বই এর দোকান। ঢাকার ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনের দুইলারের পার্ট ঘুছে গেলেও, ভারতের অনেক রেলস্টেশনের দুইলারের প্রাচীন বই এর দোকান আজও টিকে আছে।

ফরাসী দেশের এমিল মরো ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসেন; তখন তার বয়স ১৭ বছর। সেই সময় তার মামা অ্যালবার্ড, পল বার্ডের কোম্পানিতে যোগ দেন। তখন ভারতবর্ষ জুড়ে চলছে রেলওয়ের সম্প্রসারণের কাজ। মরোর অন্তরঙ্গ সামি আর্থার হেনরি হুইলারের অনেক বইয়ের সংগ্রহ ছিল। বিলেতে ফিরে যাওয়ার সময়, তিনি তার বিশাল বইয়ের সংগ্রহশালা দান করে গেছেন তান বন্ধু মরোকে। মরো সাহেবের ঘরে ছিল নিজস্ব লইব্রেরী, তার বাড়ীতে এত বইয়ের সংকুলান হয়ে উঠে না। অগত্যা তার বই বিক্রির জন্য দোকান খুঁজতে থাকেন।

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইংরেজের মত ভারতেও স্টেশন ছিল সংবাদ পত্র ও বইয়ের দোকান, যা এখনও দেশের সব রেলস্টেশনে দেখা যায়। বড় বড় রেল জংশনে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে মরো সাহেব সুলভে তার বই বিক্রি করতে শুরু করেন। এই রেলওয়ে লাইব্রেরি, ঢাকা, চট্টগ্রামে ও সৈয়দপুরের স্টেশন স্থাপন করা হয়। সে সময় বিখ্যাত তরুণ কবি ও লেখক রুডইয়ার্ড কিপলিং এর যত সব বিখ্যাত সাহিত্য বেচা শুরু হয়। কিপলিংকে ২০০ টাকার বিনিময়ে বই লেখা উৎসাহিত করে বড় বড় কোম্পানি। কিপলিং লিখে চলেন একের পর এক বই। সে যুগে মাত্র ১ রুপি দামের পেপারব্যাকগুলো দেদার বিক্রি শুরু হয়। পাঠকপ্রিয়তা তুঙ্গে পৌঁছাল। কিপলিং-এর নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। প্যারিস, লন্ডনে কিপলিং লেখায় ইউরোপ ব্যবসায়ীগণ ভারত বর্ষকে চিনল নতুন ভাবে।

১৯ শতকের শেষ দিকে তিনকড়ি কুমার ব্যানারজি যোগ দেয়ায়, বিক্রির তালিকায় যুক্ত হলো বাংলা ও হিন্দিতে বই পত্র। এর ফলে দেশের জনতা পাঠকের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠল দুলারের দোকান। পুরানো ঢাকার কোর্ট রোড ও জনসন রোডে স্থাপিত হলো হুইলারের বইয়ের দোকান। ক্রমে ক্রমে শুধুমাত্র বইয়ের ব্যবসাই নয় রেলস্টেশনের যে কোন বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য হুইলারের কোম্পানি হলো সরকারের অধিভুক্ত একমাত্র এজেন্ট।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজদের যুদ্ধের নানা খবরসহ যুদ্ধের প্রোপাগান্ডা প্রচারের জন্য হুইলারের খ্যাতি ইংরেজরা কাজে লাগাল। ইংরেজ সরকারের প্রোপাগান্ডায় অংশ নিলেন রুডইয়ার্ড কিপলিং, আথার কেনন ডয়েল লিখে চলেন জনপ্রিয় গোয়েন্দা উকল্যান শার্লক হোমের সব কীর্তি। আরও লিখতেন জিকে চেষ্টার ট্ন সাথে সাথে বৃটিশ রাজ্যের প্রত্যন্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পরল হুইলারের বইএর দোকান।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ময়মনসিংহ স্টেশন স্থাপিত হয়, ঢাকা থেকে ১০ মাইল রেললাইনে যুক্ত হয় নদী বন্দর নারায়নগঞ্জ। ইংরেজ সরকার, ফুলবাড়িয়া এলাকার ১০/৫০ একর জমি অধিগ্রহণ তৈরী হয় বড় প্লাটফর্ম ও সাথে একটি রেলওয়ে হাসপাতাল। কাগজ কলমে সেটার নামকরণ ঢাকা-স্টেশন। হুইলারের দোকানটি স্থান পায় স্টেশনের প্রবেশ মুখে। সেখানে অনেক বিলিতী সাময়িকী ও বই পত্রের সমারোহ ছিল।

পুরানো ঢাকার বাংলাবাজারে ছিল হুইলারের নিজস্ব ছাপাখানা। সেখান থেকে বিলিতি বই এর সুলভ সংকলন প্রকাশ হতো। এই বইগুলি ঢাকার ইতিহাস চর্চার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বাঙালি পাঠকদের জন্য হুইলারের দোকানে সংগ্রহ ছিল। "সচিত্র ভারত", "বসুমতি", "প্রবাসী", "ভারতবর্ষ", "শিশুসাথী", "শুকতারা", "দেশ" ইত্যাদি। চলচিত্র বিষয়ক ম্যাগাজিনও পাওয়া যেত। "ফিল্ম ইণ্ডিয়া" "দ্যা সাউন্ড" ও চিত্রালী। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত ও মায়াধর দত্তের দস্যু সোহেল সিরিজের বইগুলো। এটাই ছিল সংখ্যার বিচারে বিক্রিত বইয়ের তালিকায় শীর্ষে। সব বিক্রিত বই এর পাতায় থাকতো হুইলারের ডিম্বাকৃতি সিলমোহর।

এই সব বই-পুস্তক কিংবা সাময়িকীর ক্রেতা যে শুধু ট্রেনযাত্রীরা ছিল তা নয়। ঢাকা শহরের অনেক উৎসাহী পাঠক তাদের পছন্দের বই সংগ্রহের জন্য আসতেন হুইলারে। তারা আসতেন বইপ্রেমী হিসাবে এবং সারা বিশ্বের সাথে যোগাযোগের অভিপ্রায়ে। ঢাকার বইরে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও আখাউরা রেল জংশনে হুইলারের দোকান খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের পরও বেশ কয়েক বছর ঢাকার ফুলবাড়িয়ায় টিকে ছিল হুইলারের বইয়ের দোকান। দেশের বিশিষ্ট শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী সে সময় ছিলেন সদ্য প্রতিষ্ঠিত আর্ট কলেজের ছাত্র। শিল্পী অনেক দিন বসে বসে দূরযাত্রীদের অপেক্ষমান উত্তেজনার অনেক ছবি এঁকে গেছেন। সে ছবিগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছে হুইলারের বইয়ের দোকান। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে কমলাপুর রেলস্টেশন চালু হওয়ায়, হুইলার শেষ হয় ঢাকায়। তা হলেও, প্রবীণ অনেক ঢাকাবাসীর হৃদয়ে হুইলারের নাম গাঁথা রয়েছে। সেটা এক মধুর নস্টালজিয়া হয়ে রইল।

সূত্রঃ ফুরবাড়িয়ার এক বিস্মৃত বই এর দোকান।

স্মৃতিকথা "সিরাজুর রহমান।

প্রথম আফে: তারেক আজিজ॥

মিশন ও মিশনারী কাজ

১. *Mission* ও *Missionary* শব্দের অর্থ

খ্রিস্টমণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য হলো মণ্ডলী এক, পবিত্র, কাথলিক ও প্রৈরিতিক। প্রেরণধর্মী মণ্ডলীতে বাণী প্রচার করতে সকলেই আহূত। খ্রিস্টমণ্ডলী সর্বদাই প্রেরণমর্ধী এবং এই প্রেরণ কাজকে গতিশীল রাখে মিশনরীগণ। যিশুর নির্দেশবাণী *"সুতরাং যাও, সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর... আর জেনে রেখো, জগতের অন্তিমকাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি (মথি ২৮:১৯-২০)।"* ল্যাটিন *Missio* ও *Mittere* শব্দ থেকে শব্দটির উদ্ভব। *Mission* শব্দের অর্থ হলো *'to send'*। *Samsad Dictionary* অনুসারে 'মিশন' শব্দের অর্থ হলো- 'কার্যাদি সাধনার্থে প্রেরণ' বা 'যে কোন লোকের জীবনে ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট কাজ', 'ধর্মপ্রদেশে প্রেরিত দল বা প্রচারক দল', 'ধর্মার্থ বা জনহিতার্থ স্থাপিত প্রতিষ্ঠান'। *Missionary* শব্দের অর্থ দেয়া আছে: 'ধর্মপ্রদেশে প্রেরিত, ধর্মার্থে বা জনহিতার্থে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভূক্ত'। সহজ কথায় বলা যায় যে, 'মিশন' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো: 'প্রেরণ'। মণ্ডলী প্রেরণধর্মী। ইংরেজি *Mission* শব্দটির অর্থ হলো *to send*- অর্থাৎ 'পাঠানো'।

২. যুগে যুগে প্রেরণ কাজ

ঈশ্বর যুগে যুগে তাঁর কাজ পরিচালনা করছেন নেতা, প্রবক্তা, রাজা, ভাববাদী সর্বোপরি তাঁর পুত্র খ্রিস্টের মধ্যদিয়ে। প্রবক্তাগণ ঈশ্বরের মুখপাত্র হয়ে ইস্রায়েল জাতিকে সঠিক পথে পরিচালনা, সহায়তা ও নির্দেশনা দিয়েছেন। মানুষ স্বভাবতই বিপথগামী, আত্ম-ভোলা, স্বার্থপর, আরামপ্রিয় ইত্যাদি। বেঁচে থাকার জন্য অবশ্যই মানুষকে পরিশ্রম করতে হয় এবং সততা, বিশ্বাস ও ভালবাসার মধ্যদিয়ে মানুষকে ঈশ্বরমুখী হতে হয়। ঈশ্বর বিপথগামী মানুষকে বার বার তাঁর নির্দেশিত পথে ফিরিয়ে এনেছেন। ঈশ্বর দয়ালু, কৃপাশীল, অনাদি-অনন্তকাল ব্যাপী মানুষের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ কাজ করেন। ঐশ নির্দেশনায় মানুষ সততা, বিশ্বাস ও ভালবাসার পথে পরিচালিত হয়। মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব নিয়ে বাস করার জন্য অবশ্যই ঐশ প্রেরণা ও অনুগ্রহের প্রয়োজন রয়েছে। খ্রিস্টমণ্ডলী হলো একটি সুবৃহৎ পরিবার- যা একই বিশ্বাস, ভালবাসা, আদর্শ ও শিক্ষায় পরিচালিত হয়। খ্রিস্টমণ্ডলী সর্বদাই প্রেরণমর্ধী এবং এই প্রেরণ কাজকে গতিশীল রাখে মিশনারীগণ। যিশুর নির্দেশ বাণী: *'সুতরাং যাও, সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর... আর জেনে রেখো, জগতের অন্তিমকাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি (মথি ২৮:১৯-২০)।'*

৩. খ্রিস্টমণ্ডলীতে প্রেরণ কাজ শুরু

প্রেরণকাজ বা মিশন কাজের শুরু হয় যিশুর মনোনীত বারজন প্রেরিতশিষ্যের *(মথি ১০:১-৪)* মধ্যদিয়ে। তিনি তাদের প্রেরণকাজে পাঠান আত্মিক শক্তি দান করে। এছাড়া যিশু আরো বাহাত্তরজন *(লুক ১০:১-১২)* শিষ্যকে প্রেরণকাজে পাঠান। বারজন প্রেরিতশিষ্য পঞ্চাশত্তমী পর্বের *(প্রেরিত ২:১-৪২)* পরে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েন এবং স্থানীয়ভাবে মণ্ডলী গড়ে তোলেন। সাধু পিতর ও পল মিশনারী যাত্রা শেষে রোম নগরীতে উপস্থিত হন। তৎকালীন সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল অর্ধেক ইউরোপ। সাধু পল ও পিতরের সাহসী পদক্ষেপের জন্যেই প্রেরণকাজ ধীরে ধীরে অগ্রগতি লাভ করে। তাদের প্রচারকাজ ও শহীদ-মৃত্যুর ফলে এক সময়ে গোটা ইউরোপে খ্রিস্টধর্ম প্রচারিত হয় এবং খ্রিস্টমণ্ডলী শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপীয় মিশনারীদের প্রচার কাজের ফলে গোটা পৃথিবীতে কমবেশী খ্রিস্টধর্মের পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানেও খ্রিস্টান ধর্ম ইউরোপের ধর্ম হিসেবে অনেকে বিবেচনা করে, প্রকৃত পক্ষে খ্রিস্টধর্ম সহ অন্যান্য ধর্মের উৎপত্তিস্থল হলো এশিয়া মহাদেশ।

৪. ভৌগলিক আবিষ্কার ও প্রেরণকাজের অগ্রগতি

ভৌগলিক নতুন আবিষ্কারের সাথে সাথে মিশনারীদের প্রচার কাজের তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং নতুন নতুন মিশনারী সংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মিশনারী সংঘগুলো সভ্যতার দুয়ারে অগ্রপথিকের ভূমিকা রাখে। মিশনারী কাজের তৎপরতার সাথে কৃষ্টি-সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিনিময় হয়। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে খ্রীষ্টফার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার করার মধ্যদিয়ে নতুন পৃথিবীর সন্ধান মেলে। নানা জাতি-গোষ্ঠী অভিবাসন এর মধ্যদিয়ে নতুন নতুন জনবসতি তথা রাষ্ট্র গড়ে তুলে। ফলে নতুন ভূ-খণ্ডে মিশনারীগণ প্রচার কাজে নতুন পদক্ষেপ নেন এবং মণ্ডলী গড়ে তোলেন। প্রেরণ কাজে গিয়ে অনেক মিশনারী নিজের জীবন উৎসর্গ করেন বৈরী বাস্তবতা ও পরিবেশের কারণে। মিশনারীগণ নতুন নতুন ভূ-খণ্ডের পথ প্রদর্শক স্বরূপ। কেননা, তাদের সাহসী পদক্ষেপ, পরিশ্রম ও আত্ম-নিবেদনের ফলে নতুন নতুন স্থানে মণ্ডলী গড়ে ওঠে। মিশনারীদের জন্যে যিশুর বাণী শক্তি, সান্ত্বনা ও অনুপ্রেরণার উৎস: *"মানবপুত্র তো সেবা পাবার জন্য আসেনি, সে এসেছে সেবা করতে এবং বহু মানুষের মুক্তিপণ হিসাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে (মার্ক ১০:৪৫; যোহন ১৬:২৭-২৮)।"*

৫. প্রচার যাত্রায় ধর্মসংঘ

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলে বলা হয়েছে: "তীর্থযাত্রী মণ্ডলী নিজ প্রকৃতিগতভাবেই প্রৈরিতিক, কারণ পিতার পরিকল্পনা অনুযায়ী পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রেরণাই তার উৎস *(দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিল: মণ্ডলীর প্রেরণকাজ, অনুচ্ছেদ নং-২)।"* প্রেরণধর্মী মণ্ডলীতে প্রচার কাজের যাত্রা শুরু হয়েছে যিশুর সময় থেকেই। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মণ্ডলী পরিচালিত হয়েছে বিভিন্ন ধরণের সন্ন্যাসীদের দ্বারা। ট্রেন্ট মহাসভার (১৫৪৫-১৫৬২) সমসাময়িক যুগে ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেন পোপগণ এবং অনেক ধর্মসংঘ স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন দেশে অনেক সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়ে থাকে। প্রচার ক্ষেত্র আরো উন্মুক্ত হয় এবং মহিলাদের জন্যও ধর্মসংঘ গড়ে ওঠে। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে পোপ ৩য় পল (১৫৩৩-১৫৪৮)

জেজুইট সংঘকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমতি দান করেন। এ সময় আরো কয়েকটি সংঘ পোপ মহোদয়ের কাছ থেকে অনুমতি লাভ করে। এই সময় থেকে মণ্ডলীর ধর্মসংঘগুলো আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়াতে প্রেরণ কাজে মনোযোগী হয়। পোপগণের বিভিন্ন পত্রের মধ্যে সামাজিক উন্নয়ন ও প্রচার কাজকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

৬.'বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা'র প্রেরণকাজ

বিশ্বের অনেক দেশ রয়েছে যেগুলো 'মিশন দেশ' হিসাবে পরিচিত। মিশনারীদের প্রধান কাজ হলো 'বাণীপ্রচার' করা। বাণী প্রচারের মধ্যদিয়ে মণ্ডলী প্রসারিত ও বিকশিত হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে পোপ একাদশ পিউস ৩টি সংঘকে একত্রিত করে নাম দেন 'বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা'- যা গোটাবিশ্ব মণ্ডলীতে প্রেরণ কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্নভাবে সহায়তা দিয়ে থাকে। মিশনারীগণ খ্রিস্টবাণী প্রচার করার সাথে সাথে 'শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংলাপসহ নানা বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এর মূলকথা হলো 'খ্রিস্টাদর্শ প্রচার করা'; তথা 'ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা'। বর্তমান যুগ উন্নত প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে বটে, তবে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নের দিকটাও অবশ্যই যেন প্রাধান্য পায়। এটি মণ্ডলীর একটি বড় দিক-নির্দেশনা। প্রতি বছর বিশ্ব প্রেরণ রবিবার উদ্‌যাপন করা হয়। তাই এই মুহূর্তে আমাদের এখনো এগিয়ে আসতে হবে প্রেরণ কাজকে গতিশীল ও জীবন্ত করে তোলার লক্ষ্যে। দীক্ষিত ব্যক্তি মানুষের প্রার্থনা, সমর্থন ও আর্থিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে মণ্ডলী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং যিশুর প্রচারিত ঐশরাজ্য সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হবে- সেই প্রচেষ্টা আমাদের সকলেরই। বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা বাণী প্রচার, যাজকীয় গঠনদান, বইপত্র ছাপানো, লাইব্রেরীসহ নানাবিধ কাজ করে থাকেন যা মিশন কাজেরই অংশ।

৭. মিশনারী সংঘ প্রতিষ্ঠা ও মিশনকাজ

মণ্ডলীর প্রেরণকাজ পরিচালিত হয় মূলত প্রেরিতশিষ্যদের মধ্যদিয়ে। এর পর দীর্ঘ সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ মণ্ডলীর পরিচালনা করেন। সন্ন্যাসীগণ ছিলেন আশ্রম কেন্দ্রিক। তারা আশ্রমে থেকেই ধর্ম শিক্ষাসহ যাবতীয় ধর্মীয় কাজ পরিচালনা করতেন। সন্ন্যাসীগণ মণ্ডলীর শিক্ষা ও ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রেখেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দির শুরুতে আসিসির সাধু ফ্রান্সিস (১১৮২-১২২৬) এবং স্পেনের সাধু ডমিনিক (১১৭১-১২২১) দুটি প্রচার ধর্মসংঘ গড়ে তুলেন। যা পরবর্তী কালে বাণী প্রচার ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবদান রাখে। বর্তমানে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অনেক ধর্মসংঘ গড়ে উঠেছে যেগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল বাণীপ্রচার ও ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠা। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা গোটা বিশ্ব মণ্ডলীতে প্রচার, গঠন, ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠা, মণ্ডলী পরিচালনাসহ নানা ধরনের সহায়তা দিয়ে থাকে। এ কাজকে আরো গতিশীল ও প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য দীক্ষিত প্রতিটি ভক্তেরই বিশেষ দায়িত্ব।

৮. মিশনারী হতে সবাই আহূত

দীক্ষার গুণে সবাই মিশনারী হতে আহূত। প্রেরণধর্মী মণ্ডলীর ভক্ত-বিশ্বাসী হিসেবে আমরা সকলেই বিভিন্ন ধরণের প্রেরণ কাজ করে থাকি। মিশনারী সংঘের সদস্যগণই প্রচার কাজ করে থাকে সরাসরি বাণী প্রচার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার মাধ্যমে। সর্বজনীন মণ্ডলীতে মিশনারীগণ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্যে শিক্ষা ও সাহ্যসেবার কাজ করে থাকেন। সভ্যতার উন্নয়নে মিশনারীগণ হলেন অগ্রপথিক যারা সবার সামনে থেকে আলোকময় জীবন গড়ার পথ দেখান। বাংলাদেশ মণ্ডলী গঠনের নেপথ্যে মিশনারীদের অবদান রয়েছে। প্রথমত ডমিনিকান, বেনেডিক্টান, ফ্রান্সিসকান ও জেজুইট মিশনারীগণ বিভিন্ন স্থানে বাণী প্রচার করে ও ক্ষুদ্র পরিসরে গির্জা তৈরী করে। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল ভিকারিয়েট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আইরিশ জেজুইট ফাদার সেন্ট লেজের এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফাদার, সিস্টার ও ব্রাদার পূর্ব বঙ্গে আগমন করে এবং বৃহত্তর ঢাকা ও চট্টগ্রাম এলাকা দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অন্য দিকে ১৯৫৫ খ্রিস্টব্দে মিলানের পিমে ফাদারগণ বৃহত্তর দিনাজপুর, রাজশাহী ও খুলনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই দুটি ধর্মসংঘ ধর্ম প্রচার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয় সহ নানা ধরনের মানবিক কাজ করে থাকেন।

বাংলাদেশ মণ্ডলীতে খ্রিস্টের বাণী বীজ বপিত হয়েছে ৫০০ বছর আগে এবং ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে দিয়াংয়ে ৫০০ বছরের পূর্তি উৎসব (১৫১৭-২০১৭) উদ্‌যাপিত হয়েছে। বহু ঝড়-ঝাঁপ্‌টা ও বৈরী বাস্তবতা পেরিয়ে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে বর্তমানে আটটি ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি গলধঘর্ম মিশনারীদের ত্যাগ, কষ্ট ও পরিশ্রমের ফসল। দিন দিন মিশনারীদের সংখ্যা কমে আসছে আর সময়ও হয়েছে স্থানীয় মানুষদের দায়িত্ব গ্রহণ করার। ঈশ্বর মিশনারীদের মধ্যদিয়ে অনেক বড় বড় কাজ করেছেন। তাদেরই পথ ধরে স্থানীয় যাজক ও ব্রতধারীগণ মিশনারী কাজ অব্যাহত রাখবে সেই প্রচো আমাদের প্রত্যেকেরই। বিশ্বাসী ভক্ত হিসেবে আমাদের প্রার্থনা, সমর্থন, সহায়তা ও আর্থিক অনুদানের মধ্যদিয়ে আমরা প্রচার কাজের অংশীদার হয়ে উঠি। এই প্রেরণ কাজের ফলে গোটা বিশ্বে খ্রিস্টাদর্শ প্রচারিত হোক এই প্রত্যাশা, প্রচেষ্টা ও প্রার্থনা করি!

ত্রাণকর্তার আগমন

লাকী সরেন

শিশু যিশু এলেন এ ধরনীতে
গোয়াল ঘরে মেরীর কোলে
তীব্র শীতের মাঝে।
যিশুর জন্মের আনন্দেতে
সাজবো মোরা নতুন সাজে
এই খুশীতে বাজলো বাঁশি
করছে সবাই নাচানাচি।
সবার মুখে ফুটলো আজি
মিষ্টি মধুর হাসি
শিশু যিশুর আগমনে
ধন্য হলো মানবকুলে
যিশুর জন্মের শুভক্ষণে থাকবো
সবাই মিলে ।
নত নম্র হবো মোরা যিশুর চরণতলে॥

নিস্প্রাণ গতি

উদাস পথিক

ভরা বর্ষায় টই-টুম্বর
বর্ণিল রেখা চিত্রের মতো
নদীকে জিজ্ঞাস করেছিলাম
তোমার দুঃখ কিসের?
ম্লান মুখে নদী বলেছিলো 'শুষ্কতা'
শালীন পোষাক পরিহিতা
শুদ্ধ-সুন্দর রমণীকে জিজ্ঞাস করেছিলাম
তোমার দুঃখ কিসের?
ম্লান বদনে; বিষন্ন ভাবে
বলেছিলো 'বিরহে'
'শুষ্কতা আর বিরহ' সমার্থক
কিনা জানিনা
জানি শুধু 'শুষ্কতা' আর 'বিরহ'
দু'টোই 'নিঃস্প্রাণ গতি' নিরান্দের
রেখা চিত্র॥

কিছু টাকা আমার ব্যাগে রেখে দেই

জয় আন্তনী রোজারিও

কী ব্যাপার দাদু, কোথাও যাচ্ছ বুঝি? হ্যাঁ দাদুভাই, বাবা-মা'র সাথে বাজারে যাচ্ছি। নতুন জামা কিনতে- শ্রাবণ উত্তর দিল। খুব ভালো, দাদু। আচ্ছা, তুমি কী শুধু জামাই কিনবে, জুতা কিনবে না? "হ্যাঁ, দাদুভাই , মা বলেছে জুতাও কিনে দিবে। কিন্তু দাদুভাই, একটা প্রশ্ন সবসময় মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। কোনো ভাবেই উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। দাদু বলল, চাইলে আমাকে বলতে পারো দাদু, দেখি, উত্তর দিতে পারি কিনা। আচ্ছা, দিন তো দিনই। বড়দিন আবার কী? যার জন্য এতো আয়োজন! ঠিক বলেছো দাদু, খুব কঠিন প্রশ্ন। মাথা ঘুরপাক খাওয়ারই কথা। তারপরও চেষ্টা করে দেখি। হুম ... আসলে দাদু, এটি হচ্ছে বিশেষ দিন। এদিন প্রভু যিশুখ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঠিক আছে, কিন্তু তাতে আমাদের কি? আমরা কেন তাঁর জন্মদিন পালন করব? ওমা! কী বল দাদু! তিনি যে আমাদের সবার জন্য জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি আমাদের সবার ভাই। তাইতো এদিন আমরা খুব জাঁকজমক ভাবে আনন্দ-ফূর্তি করি। আচ্ছা বুঝলাম, কিন্তু তুমিও তো আমার ভাই। আদরের দাদুভাই। তুমি তাহলে জন্মদিন পালন কর না কেন? এবার বড়দিনে তুমি কেক কাটবে। আমরা তোমারও জন্মদিন পালন করব। কথাটা শুনে দাদুর চোখে জল এসে গেল। আচ্ছা দাদুভাই, আমি জামা কিনতে যাচ্ছি। তুমি যাবে না? না দাদু! ওমা! তাহলে বড়দিন উৎসব করবে কীভাবে? কেন, আমার তো অনেক জামা আছে। তাহলে তুমি বলছ, জামা না কিনলেও বড়দিন উৎসব পালন করা যায়। হ্যাঁ দাদু, শুধু আমি নই। তোমার

ছবি: অংকুর আন্তনী গমেজ

মতো অনেক দাদু আছে যারা বড়দিনের জামা কিনে না। কেন? কেননা তাদের পারিবারিক অবস্থা ভালো নয়। নতুন জামা কেনার মতো যথেষ্ট টাকা নেই। তাহলে, আমরা কি তাদের জামা কিনে দিতে পারি না? অবশ্যই পারি। কিন্তু তুমি তো জানোই দাদু, আমার কাছে কোনো টাকা নেই, আমি তো উপার্জন করতে পারি না। তাতে কী, আমি টাকা দেব। তুমি! দাদু তো হতবাক। তুমি কোথা থেকে টাকা দেবে দাদু। কেন? আমাকে প্রতিদিন টিফিনের জন্য মা যে টাকা দেয়। তা তো পুরোটা খরচ করি না। কিছু টাকা আমার ব্যাগে রেখে দেই। তুমি দাঁড়াও, আমি আসছি। শ্রাবণ এক দৌড়ে ঘর থেকে টাকার ব্যাগ আনল। দাদুভাই গুনে দেখল অনেক টাকা জমিয়েছে দাদু। প্রায় দু' হাজার টাকা। শ্রাবণের এ উদারতা দেখে দাদুভাই নিজেও সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। সে বয়স্ক ভাতার যে টাকা পায়, তা থেকে সাহায্য করবে। দাদুভাই, এ টাকা দিয়ে কি নতুন জামা পাওয়া যাবে- শ্রাবণ জানতে চাইল। হ্যাঁ দাদু। তাহলে আগামীকাল সকালেই আমরা বাজারে যাব। তবে আমার একটা শর্ত আছে। মুশকিল তো! আবার কীসের শর্ত? মাকে বলবে না। তাহলে আমাকে টিফিনের টাকা দেয়া বন্ধ করে দিবে। আচ্ছা দাদু , কাউকে বলবো না। কিন্তু দাদুভাই, আমরা জামা তো কিনছি। কাকে দিব তা তো ঠিক করিনি। বড় চিন্তার বিষয়। ভেবে দেখ তো, তুমি তোমার কোনো বন্ধুকে দিতে চাও কী না? হুম! অন্য ও অধয়কে দেওয়া যায়। তবে তাদেরই দিবে। আচ্ছা যাও দাদু, মা ডাকছে। যেই কথা সেই কাজ। পরদিন সকালে দাদু ও শ্রাবণ বাজার থেকে দু'জনের জন্য পাঞ্জাবি, প্যান্ট ও জুতা কিনল। আর বাজার থেকে আসার পথেই তাদের হাতে জিনিসগুলো দিল। একই সাথে, দাওয়াত দিয়ে আসল। যেন তারা কাল বড়দিনের খ্রিস্টযাগ শেষ করেই দাদুরা জন্মদিনের কেক কাটতে আসে। ২৫ তারিখ সকালে দাদু নাতির কাজ দেখে তো সবাই অবাক। দেখে সবাই একে অপরকে প্রশ্ন করতে শুরু করলো। এটা কীভাবে সম্ভব হলো। দাদু সকলের অবস্থা বুঝতে পেরে নিজেই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। তাতে সবারই চেতনা ফিরে আসল। নিজেরা খুবই লজ্জিত হলো। তারা প্রত্যেকেই শ্রাবণের প্রশংসা করতে লাগলো। শ্রাবণের কাছে শপথ করলো, আজ থেকে তারাও অন্যের মঙ্গলার্থে এগিয়ে আসবে। তাই শ্রাবণকে বললো, অন্য ও অধয'র পরিবারকে রাতের খাবারে যোগ দেবার জন্য দাওয়াত করতে। এতে শ্রাবণ খুবই খুশি হলো। সে মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো, তার মাধ্যমে অন্যদের বিবেকবোধ জাগ্রত করার জন্য। এসো বন্ধুরা, শ্রাবণের মতো আমরাও ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে প্রকৃত আনন্দ উপলব্ধি করি ও অন্যদের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠি। কেননা ভোগে নয়, ত্যাগেই পরম সুখ॥

অবন্তিকা মণ্ডল
২য় শ্রেণি
ইস্টার্ন ল্যাবরেটরি স্কুল

একটি শিশির বিন্দু

হেলেন রোজারিও

"বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে,
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।"

কবি গুরু রবীন্দনাথ ঠাকুরের এই পক্তিটুকু আমরা অনেক লেখায় অনেক দেখায়, অনেক ভ্রমণে দেশে বিদেশে প্রয়োগ, ব্যবহার করে থাকি। সবুজ শ্যামল ধান ক্ষেত বা ধানের গাছের পাতায় শ্বেতশুভ্র মুক্তোর মতো শিশির বিন্দু চোখে পড়লেই "একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশির বিন্দু" কবিতাটি মনে পড়ে যায়। আসলেই ধানের সবুজ পাতায় শিশির বিন্দু অপূর্ব সুন্দর। সাদা কালো শিশির বিন্দু সবার নজরে পড়ে।

এই ছোট্ট কবিতাটির একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। যাকে উদ্দেশ্য করে বা যাকে উপহার হিসেবে দেয়ার জন্য কবিগুরুর এই কবিতা তিনি অনেক ভাগ্যবান ব্যক্তিত্ব। বাংলাভাষা, বাংলাসাহিত্য জগতে বিশেষ করে বাংলা সিনেমা জগতের কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব সত্যজিৎ রায়। যখন তার বয়স ৭ বছর তখন মায়ের সাথে শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলায় গিয়েছিলেন। সাথে 'হোয়াইট লেডলের' দোকানে কেনা নূতন অটোগ্রাফ খাতা। তার মনে ছিল রবিঠাকুর যখন তখন কবিতা লিখে দেন। তারও তাই শখ হলো।

সত্যজিৎ রায়ের কথায়- "শান্তিনিকেতনের উত্তরায়নে" গিয়ে দেখা করলাম তার সঙ্গে। জানালার দিকে পিঠ করে চেয়ারে বসে আছেন। সামনে টেবিলের উপর বই আর খাতা, চিঠি পত্রের অগোছালো স্তুপ। চোখের সামনে দেখছি রঙ বেরঙ্গের ডাকটিকেট লাগানো বিদেশী চিঠির খামগুলো সেখান থেকে উঁকি মারছে। অটোগ্রাফের খাতাটা আমি এগিয়ে দিলেও কবিতার ফরমায়েশ এলো মা এর কাছ থেকেই। আমি ছিলাম বেজায় মুখচোরা বিশেষ করে রবিবাবুর সামনেতো বটেই। কিন্তু কই তখন তো লিখলেন না কবিতা। তাতে যে একট নিরাশও হয়েছিলাম মনে আছে। বললেন 'কাল সকালে এসে নিয়ে যেও।'

গেলাম পরদিন সকালে। বুকের ভিতর টিপটিপ করছে। এত কাজের মধ্যে আমার খাতায় কবিতা লেখার কথা কি আর মনে থাকবে? বললেন, লেখা হয়ে গেছে। মিনিট দশেক খোঁজা খুঁজি করে ছোট্ট বেগুনী খাতাটা বেরলো একরাশ বইয়ের নিচ থেকে। সেই খাতার প্রথমপাতা খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন "এর মানে আরেকটু বড় হলে বুঝবে।" সেই দিন হতে বার বছর অবধি ছিল আমার একার জিনিস। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সেটা পত্রিকা ও বইয়ের পাতায় ছাপা হওয়ার ফলে হয়ে গেল সকলের।

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার, অস্কার বিজয়ী সত্যজিত রায়কে দেখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে বিশেষ কোন সুপ্ত প্রতিভার প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল সত্যজিত রায় তাঁর কাছে কিছু দিন থাকুক। শান্তিনিকেতনে তিনি ছবি আঁকাও শিখেছিলেন। তিনি ছিলেন শিল্পী, সাহিত্যিক ও বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার। তার সর্বশ্রেষ্ঠ ছায়াছবি "পথের পাঁচালী" বিশ্ব জুড়ে জয়জয়কার হয়ে আছে। এছাড়াও তার বিখ্যাত ছায়াছবি হীরকরাজার দেশে, সোনার কেল্লা, জয়বাবা, ফেলুদা, অপুর সংসার, চারুলতা, নায়কসহ আরো অনেক আনেক ছায়াছবি নির্মাণ করে ছায়াছবির জগতকে উদ্ভাসিত করে অমর হয়ে আছেন। *- তথ্য সূত্র: ভারত বিচিত্রা ২০০৭*

অতি বুদ্ধির চমকানী

সিস্টার মেরী এনিটা এসএমআরএ

মানুষ হলেন সেই ব্যক্তি যার মান (সম্মান) এবং হুশ (জ্ঞান) আছে। অর্থাৎ যার জ্ঞান, বুদ্ধি, মান-সম্মান আছে সেই মানুষ। জন্ম থেকেই আমরা প্রত্যেকে মানুষ। কিন্তু আমাদেরকে হয়ে উঠতে হয়। ধাপে ধাপে পথ চলে আমাদেরকে তা হয়ে উঠতে হয়। এই হওয়ার কোন শেষ নেই। এর প্রক্রিয়া চলমান, মৃত্যু পর্যন্ত। প্রত্যেকটা মুহূর্তই থাকে হয়ে উঠার জন্য। এই হওয়ার পথে আমাদের পাশে থাকেন অনেক ব্যক্তি। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে তাদের অবদান অপরিসীম। সেই সাথে থাকে ব্যক্তির আপ্রাণ চেষ্টা।

ঈশ্বর প্রত্যেক মানব ব্যক্তিকে দান করেছেন ইচ্ছাশক্তি, বুদ্ধিশক্তি ও চিন্তাশক্তি। যেন আমরা এসব কিছু ব্যবহার করে জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারি। তিনি বুদ্ধিশক্তি এবং চিন্তাশক্তি রেখেছেন নিজের কাছে। তার কাছে সর্বদা বুদ্ধি ও চিন্তার জন্য আবেদন করতে হয়, প্রার্থনা করতে হয়। কিন্তু ব্যক্তির ভাল-মন্দ নির্ধারণ করে, বিচার-বিবেচনা করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারেন।

এখন দৃষ্টি দিই ঈশ্বরপুত্র যিশুর দিকে। যাঁর জন্ম দিন আমরা ঘটা করে পালন করছি সারা বিশ্ব জুড়ে। তাঁর ছিল দুইটা স্বভাব। ঐশ স্বভাব এবং মানবীয় স্বভাব। যা আমরা সকলে বিশ্বাস করে থাকি। ঐশ স্বভাব নিয়ে ঈশ্বর হয়ে শুধু স্বর্গে বসে থাকেননি বা জীবন-যাপন করেননি। কিন্তু মানব স্বভাব ধারণ করে আমাদের সাথে অর্থাৎ অতি সাধারণ জনগণের সাথে পথ চলেছেন, জীবন-যাপন করেছেন, খাওয়া-দাওয়া করেছেন। এখানে দেখি ঈশ্বরের অতি বুদ্ধির চমকানী। অর্থাৎ ঈশ্বরের যে কত বুদ্ধি তার চমক আমরা দেখতে পেয়েছি। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে আমাদের মাঝে পাঠিয়েছেন মানব জাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করতে। তাঁর এ দূরদৃষ্টির জন্যে আমার মুক্তি লাভ করতে পেরেছি। ঈশ্বর মানুষ হলেন এটা আমাদের জন্যে এক বড় চমক। সেই সাথে তিনি মৃত্যু থেকে জেগে উঠলেন। এটি আরও একটি বড় চমক। যিশু যা কিছু করেছেন এ সবই চমকের মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ ঈশ্বর অতি বুদ্ধির চমকানী দেখিয়েছেন প্রতি মুহূর্তে-প্রতিক্ষণ।

আমাদের প্রতিদিনকার জীবনেও অনেক ব্যক্তির অতি বুদ্ধির চমকানী দেখতে পাই। অর্থাৎ অতি বুদ্ধির চমক দেখাতে গিয়ে পরে যায় বড় বড় বিপদে। এরপর উদ্ধারের আর কোন পথ খুঁজে পায় না। অতি চমক দেখাতে গিয়ে, কি যে বলে, আর কি যে করে, আর কোথায় যে যায় তার কোন হদিস নেই। মনে করে আমিই সর্বে-সর্বা। আমি যা বলি সব ঠিক। আমার কোন ভুল হতেই পারে না। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, "যার বুদ্ধি হয় না নয় বছরে, তার নব্বই বছর বয়সেও হবে না। ঈশ্বর তাঁর বুদ্ধির ঠিক ঠিক কাজে লাগিয়েছেন কিন্তু আমরা মানুষেরা এর ব্যতিক্রম। সুতরাং আমরা ঈশ্বরের মত হতে পারব না আর চমকও দেখাতে পারব না। তাই আমাদেরকে একটা সীমার মধ্যে থাকতে হবে। অতি বুদ্ধির চমক দেখাতে গিয়ে আমরা যেন ভুল করে বসে না পরি। ঈশ্বর আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন॥

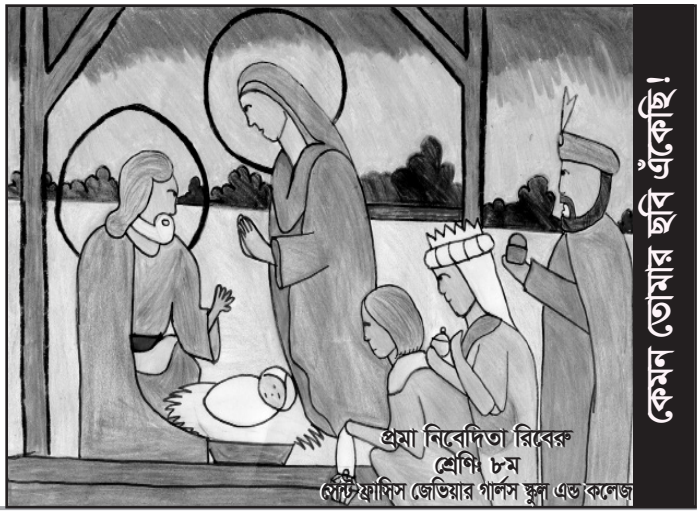

প্রমা নিবেদিতা রিবেরু
শ্রেণি: ৮ম
সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ

পবিত্র বাইবেল থেকে লেখা, মানব জাতির জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা

মাস্টার সুবল

ছবি: ইন্টারনেট

এক ঈশ্বর আছেন। এক ঈশ্বরে তিনব্যক্তি: পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। পুত্র ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণের জন্য মানুষ হলেন এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন।

মানব জাতির দুটি দিক জন্ম ও মৃত্যু। প্রভু পরমেশ্বর মাটি থেকে ধুলো নিয়ে মানুষকে গড়লেন এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার মধ্যে প্রাণবায়ু সঞ্চার করলেন, আর মানুষ সজীব প্রাণী হয়ে উঠল। মানুষের জন্য উপযোগী কোন সহায়ক না পাওয়ায় প্রভু পরমেশ্বর মানুষের উপর গভীর নিদ্রা নামিয়ে এনে তিনি তার একটা পাঁজর তুলে নিয়ে এক নারী গড়লেন ও তাকে মানুষের কাছে আনলেন। আর মানুষ বলল, এবার এ-ই হল আমার হাড়ের হাড় ও আমার মাংসের মাংস। এর নাম হবে নারী। কেননা, নর থেকেই তাকে তুলে নেওয়া হয়েছে। নর ও নারীকে প্রভু পরমেশ্বর এদেন বাগানে রাখলেন ও কিছু আদেশ দিলেন। কিন্তু এদেন বাগানে তারা প্রভু পরমেশ্বরের আদেশ অমান্য করে মৃত্যুকে ডেকে আনলেন।

মানুষের জন্মে মানুষের শরীর বিশেষ করে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক বিভিন্ন দিক কাজ করে। কাজগুলোর মধ্যে মন্দ কাজগুলো আসে- অহংকার, লোভ, কাম, ক্রোধ, পেটুকতা, হিংসা এবং অলসতার মধ্যদিয়ে। ভালকাজের জন্য পরকালে বিচারে আত্মা পায় অনন্তকালের জন্য চিরশান্তি, আর মন্দ কাজের জন্য পরকালে বিচারে আত্মা পায় অনন্তকালের জন্য নরকের অগ্নিময় চিরশাস্তি। অনন্তকালের চিরশান্তি স্বর্গসুখ পেতে প্রভু যিশুখ্রিস্টকে অনুকরণ করতে হয়। মনে রাখতে হবে, বিশ্বাস, আশা ও প্রেম দ্বারা মঙ্গলময় সমস্তই জয় করা যায়। পুত্র ঈশ্বর মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে মঙ্গলময় সমস্ত কিছুই করেছেন। আমাদেরও সবার তা করতে হবে।

আমরা ২৫ ডিসেম্বর যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন পালন করি কারণ ২৫ ডিসেম্বর যিশুখ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করেছেন। যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন পালন উপলক্ষে বিভিন্ন দিকে, বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিভিন্ন পিঠা-পুলি এবং বিভিন্ন ভোজের আয়োজন করে থাকি। সুরা পান একটা প্রাচীনতম প্রথা যা ছাড়া বয়স্কদের আনন্দটা তেমন জম-জমাট হয় না। সুরা ছাড়া মিষ্টি মুখে ও মিষ্টি হাঁসির ও আদর থাকে না। কীর্তনে তাল আসে না। আমাদের মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন, প্রভু যিশুখ্রিস্টের জন্মদিনে আমরা যেন অতিরিক্ত কিছু না করি। প্রার্থনা করি মুক্তিদাতা প্রভু যিশুখ্রিস্টের কাছে, তিনি যেন বিশ্ববাসীকে করোনা ভাইরাসসহ বিভিন্ন অসুস্থতা থেকে মুক্ত রাখেন। বিশ্বে বিভিন্ন দেশ যেন যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তিতে বসবাস করেন॥

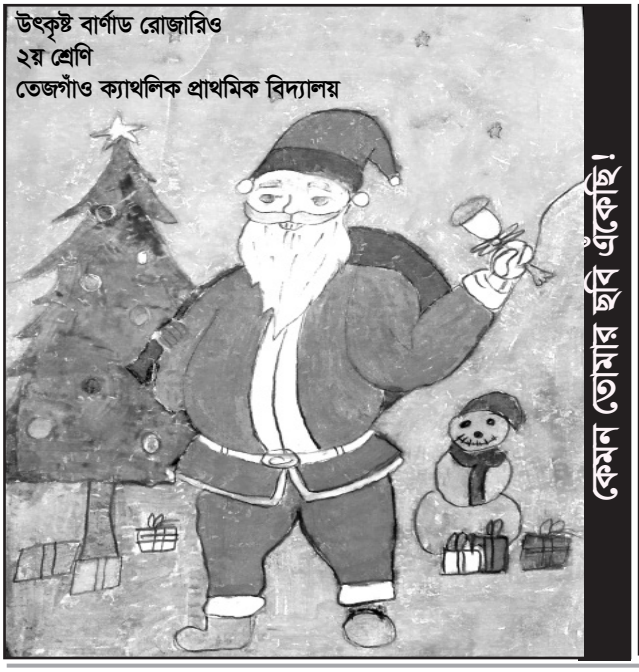

উৎকৃষ্ট বার্ণাড রোজারিও
২য় শ্রেণি
তেজগাঁও ক্যাথলিক প্রাথমিক বিদ্যালয়

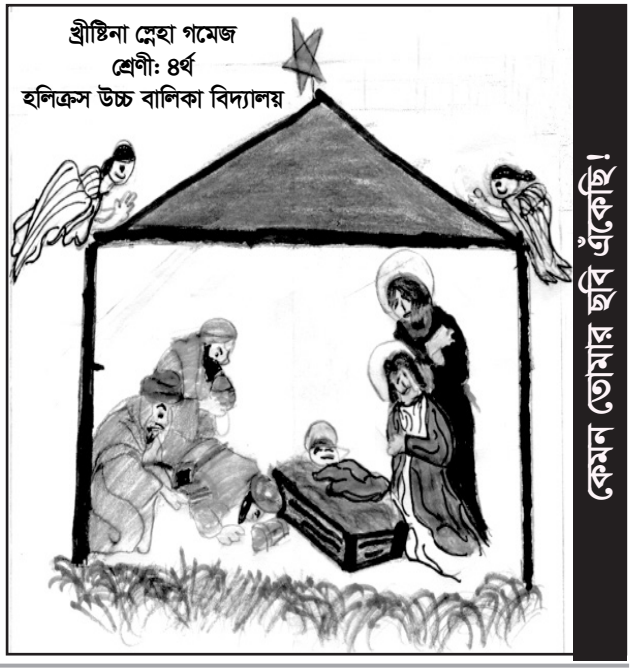

খ্রীষ্টিনা স্নেহা গমেজ
শ্রেণী: ৪র্থ
হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ একটি জাতীয় পর্যায়ের স্থানীয় অলাভজনক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, যা সমাজকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে। এই প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন মোবাইল টেকনিক্যাল ট্রেনিং স্কুল প্রকল্পে নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ ও প্যানেল তৈরীর জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তাবলী সমূহ নিম্নরূপ:

পদের বিবরণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা	অন্যান্য যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি
১. টেকনিক্যাল অফিসার (এমটিটিপি) **পদ সংখ্যা :** ০১ টি (পুরুষ/মহিলা) **নিয়োগের ধরন :** ছয় মাস শিক্ষানবীশ কাল। অতঃপর কর্মদক্ষতা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় গুণাবলী ও যোগ্যতা যাচাই সাপেক্ষে সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী স্থায়ী হওয়ার সুযোগ আছে। **বয়স :** ২৫-৪০ বছর। (১৫/১২/২০২২ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী)। **বেতন :** শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে মাসিক ২৫,০০০/- (পচিঁশ হাজার টাকা) **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং/গ্র্যাজুয়েট এবং যে কোন টেকনিক্যাল ট্রেডে এক বছরের কোর্স সম্পন্ন করেছেন এমন প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন। **কর্মস্থল ও যাতায়াত :** কারিতাস ঢাকা আঞ্চলিক অফিস। তবে প্রকল্পের কাজের জন্য মাসে কমপক্ষে ১৫ দিন মাঠ পরিদর্শন করতে হবে। **সুবিধাদি :** চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইন্স্যুরেন্স স্কীম, হেল্‌থ কেয়ার স্কীম এবং বৎসরে দু'টি বোনাস প্রদান করা হবে।	• সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। ইংরেজী ও বাংলা শুদ্ধ উচ্চারণ ও লেখার দক্ষতা আছে। • ব্রাদার ডোনাল্ড টেকনিক্যাল স্কুল (আরটিএস) এবং মোবাইল টেকনিক্যাল ট্রেনিং প্রকল্প পরিচালনা, মনিটরিং, প্রশাসনিক ও সব ধরণের হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে সক্ষমতা আছে। • আরটিএস এবং এমটিটিপি প্রকল্পের বিভিন্ন ট্রেডে বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজ যোগাড় ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের স্বনির্ভরতা অর্জনে চ্যালেঞ্জ নেয়ার মত দক্ষতা আছে। • কর্মী পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও যোগ্যতা আছে। • দাতা সংস্থার চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে দক্ষতা আছে। • দলীয় স্পিরিট বজায় রেখে কাজ করার মানসিকতা আছে। • **MS Office (MS Word, MS Excel, Power Point, MS Excess (Data Entry Software),** ইন্টারনেট, ই-মেইল, পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে। • বৈধ লাইসেন্সসহ মোটর সাইকেল চালাতে পারে এবং প্রত্যন্ত এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে কাজের অভিজ্ঞতা আছে। • সৎ, বিনয়ী, পরিশ্রমী এবং কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তথা পেশাগত দক্ষতা সম্পন্ন হতে হবে।

আবেদনের শর্তাবলী :

১. আঞ্চলিক পরিচালক বরাবর আবেদন করতে হবে এবং আবেদন পত্রের সাথে প্রার্থীর জীবন বৃত্তান্তে যে সকল বিষয়গুলো অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে : ক) প্রার্থীর নাম খ) পিতার নাম গ) মাতার নাম ঘ) জন্ম তারিখ ঙ) বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা চ) স্থায়ী ঠিকানা ছ) মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল এডড্রেস (বাধ্যতামূলক) জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঝ) ধর্ম ঞ) জাতীয়তা ট) বৈবাহিক অবস্থা ঠ) বর্তমান ও পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, কর্মরত তত্ত্বাবধায়ক/ব্যবস্থাপকের নাম, পদবী, ই-মেইল আইডি ও মোবাইল নম্বর ও আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক আবেদনে উল্লেখ করতে হবে। ড) দুই জন রেফারেন্স (পরিবারের সদস্য কিংবা আত্মীয় নন) এর নাম, ঠিকানা, ই-মেইল আইডি, মোবাইল ফোন নম্বর ও আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখ করতে হবে।

২. আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্রের অনুলিপি, জাতীয় পরিচয় পত্র (NID), অভিজ্ঞতার সনদপত্র, চারিত্রিক সনদ পত্র ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

৩. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের বর্তমান ঠিকানায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে।

৪. ধুমপান ও নেশা দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই। ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা কারোর মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৫. আবেদনপত্র আগামী ০৫/০১/২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে/ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌছাঁতে হবে। সরাসরি কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। পদের নাম খামের উপর স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

৬. ত্রুটিপূর্ণ/ অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

৮. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.caritasbd.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

কারিতাস বাংলাদেশ একটি জাতীয় পর্যায়ের স্থানীয় অলাভজনক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে। কারিতাস বাংলাদেশ সকল ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশেষভাবে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানে সর্বদা দায়বদ্ধ থাকতে সচেষ্ট। কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে সকল প্রকল্প অংশগ্রহণকারী, শিশু , যুবা ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। কারিতাস বাংলাদেশের কোন কর্মী, প্রতিনিধি, অংশীদারীদের দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের যেকোন ধরণের ক্ষতি, যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও শোষণমূলক কর্মকান্ড সংঘঠিত হলে তা কারিতাস বাংলাদেশের শূণ্য সহ্য নীতিমালায় (Zero Tolerance) বর্ণিত শাস্তির আওতাভূক্ত হবে।

আবেদনের ঠিকানা
আঞ্চলিক পরিচালক
কারিতাস ঢাকা অঞ্চল,১/সি, ১/ডি, পল্লবী, সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

"কারিতাস বাংলাদেশ কর্মী নিয়োগে সম-সুযোগদানে বিশ্বাসী"

৩২তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত যোসেফ গমেজ
জন্ম: ২৯ আগস্ট, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৪ জুলাই, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ
সোনা মাতবর বাড়ি, পুরাতন বান্দুরা

ব্যক্তিজীবনে আমাদের বাবা ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে প্রকৃতির মানুষ, পাশাপাশি ছিলেন অকুতোভয়, সংগ্রামী এক পুরুষ। সত্যনিষ্ঠ এই পরিশ্রমী মানুষটি স্বীয় পরিবার প্রতিবেশি ও আশেপাশের মানুষের কাছে ছিলেন এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে ভাই-বোনদের যথাসম্ভব আগলে রাখতেন তিনি। যে কারণে নিজের প্রতিও বেখায়ালী ছিলেন।

সুশিক্ষিত সুদর্শন নিরঅহংকার ধর্মানুরাগী এই মানুষটি তৎকালীন সাধারণ বীমা কর্পোরেশনে প্রথম শ্রেণির সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করতেন। সে সুবাদে যারাই কোন কিছু সত্যায়ন করতে বা কোন কাজে যেতেন নিরাশ হয়ে ফেরেনি। মহানুভাব এই প্রিয়জন অনেকটাই অসময়ে সবাইকে ছেড়ে ইহলোক ত্যাগ করেন ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুলাই ।

৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত আশা এলিজাবেথ গমেজ
জন্ম: ৩০ অক্টোবর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১২ মার্চ, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
লক্ষীবাজার ধর্মপল্লী, ঢাকা।
পিতা: প্রয়াত মন্তি গমেজ
মাতা: প্রয়াত ম্যাগ্দালিনা গমেজ

আমাদের মা ছিলেন সৎ, নিষ্ঠাবান, ধর্মপরায়ন, বহুমাত্রিক এক আলোকিত নারী। সংসার জীবনের প্রত্যুষেই স্বামীহারা হয়েও নিজ সংসার আর সন্তানদের আগলে রাখতেন প্রতিক্ষণ।

অত্যন্ত সাহসী, পরিশ্রমী, প্রতিবাদী এ মানুষটি পেশা ছিল শিক্ষকতা। সামাজিক নানা কাজে ছিলেন নিবেদিত, লক্ষীবাজার খ্রিস্টান মহিলা সমিতির প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এছাড়া অনেক বঞ্চিত মানুষদের অর্থসহ বহুপ্রকার সাহায্য সহযোগীতা করেছেন সাধ্যমত।

অতিথি আপ্যায়নে তিনি ছিলেন সমাদৃত আর মধ্যমণি। সামাজিক অনাচার আর অসঙ্গতি নিয়ে লেখালেখিও করেছেন প্রচুর। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে নিজের গড়া সেন্ট মার্টিন কিণ্ডার গার্ডেন স্কুলটি রক্ষাণাবেক্ষণ করেছেন জীবনের শেষ অবধি। কর্মনিষ্ঠ এই সাহসীনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন ১২ মার্চ ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে।

৩য় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত টমাস মার্টিন গমেজ
জন্ম : ১২ নভেম্বর, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১১ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

পিতা: প্রয়াত যোসেফ গমেজ
মাতা : প্রয়াত আশা এলিজাবেথ গমেজ
লক্ষীবাজার ধর্মপল্লী, ঢাকা

চলে তো যেতেই হয়, চলে তো যাবেই সবে, এটাই নিয়ম। কিন্তু কেউবা আগে কেউবা পরে। তবুও জীবন চলে তার আপন নিয়মে। তোমরা যেথায় আছো মঙ্গলে থেকো, যেমনটি তোমরা আমাদের রেখেছিলে। তোমাদের আশীর্বাদ আমাদের জন্য রেখো, যেমন রেখো গেছ তোমাদের সততা, শিক্ষা আর আদর্শ। প্রার্থনা করো আমরা যেন তোমাদের উপলব্ধি থেকে এক তিলও বিচ্যুত না হই। সুখ আর চির শান্তিতে থেকো তোমরা।

শোকার্ত স্বজন

ইভান্স, প্রীতি, যোসেফ ইভান্স, মেরী জোসেলিন, এঞ্জেলিন, আশা, জ্যাকলিন-পাখী, অরনি গুনগুন, রনবীর রাজ্য, শিউলী, লিজ এলিজাবেথ গমেজ।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

২০২২ খ্রিস্টাব্দে পোপ মহোদয় ও ভাতিকানের ১২টি গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

মহামারী-উত্তর স্বাভাবিক জীবনে পুনরায় ফিরে আসার প্রচেষ্টায় একটি ব্যস্তময় বছর কাটিয়েছে পোপ মহোদয় ও ভাতিকান। যার শুরু হয়েছিল নববর্ষে মা মারীয়ার আশীর্বাদ গ্রহণের মধ্যদিয়ে

জানুয়ারি ২০: পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টকে জড়িয়ে একটি রিপোর্ট

১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অবসরপ্রাপ্ত পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট যখন মিউনিখের আর্চবিশপ ছিলেন তখন তার অধীনে থাকা ৪জন পুরোহিত দ্বারা সংঘটিত যৌন নিপীড়নের মামলাগুলোকে তিনি ভুলভাবে পরিচালনা করেন বলে বছরের শুরুতেই এক রিপোর্টের ভিত্তিতে ভাতিকানে অভিযোগ উঠে। পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট ৮২ পৃষ্ঠার এক নথিতে পয়েন্ট উল্লেখ করে তা খণ্ডন করেছেন। রিপোর্ট প্রকাশের ৩ সপ্তাহের পর, অবসরপ্রাপ্ত পোপ মহোদয় চরম ঘৃণা ও গভীর দুঃখ প্রকাশ করে নিপীড়নের শিকার ব্যক্তিদের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা যাচনা করেন। তবে, তিনি যে কোন ভুল করেছেন তা অস্বীকার করেন। পোপ ১৬শ বেনেডিক্ট তাঁর ঘনিষ্ঠজনদেরকে ও পোপ ফ্রান্সিসকে ধন্যবাদ জানান তাকে সমর্থন জানানোর জন্য। পোপ মহোদয় আরো বলেন, 'একজন খ্রিস্টান হবার অনুগ্রহ আমার কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটি আমাকে জ্ঞান দেয় এবং জীবনের বিচারকর্তার সাথে প্রকৃত বন্ধুত্বও দেয়; যা আমাকে মৃত্যুর দ্বার অতিক্রম করতে আত্মবিশ্বাস জাগায়।

ফেব্রুয়ারি ২৫: পোপ ফ্রান্সিস রাশিয়া দূতাবাস পরিদর্শন করেন

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরু করে ইউক্রেন দখলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ইউক্রেন-রাশিয়া নিয়ে বিশ্ব উদ্বিগ্ন কিন্তু পোপ ফ্রান্সিস ভীষণ চিন্তিত ও এ সমস্যা সমাধানের জন্য সম্ভবপর সকল কিছু করতে ইচ্ছুক। তাইতো সব প্রটোকল ভেঙ্গে পোপ মহোদয় রাশিয়ার দূতাবাসে গিয়ে হাজির হন ২৫ ফেব্রুয়ারি। সাধারণ কোন রাষ্ট্রদূত বা রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে দেখা করতে হলে ভাতিকানেই সেই বৈঠক করেন পোপ মহোদয়। সময়ক্ষেপণ না করে পুণ্যপিতা রাশিয়ার দূতাবাসে গিয়ে ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। দূতাবাসে তিনি আধ ঘন্টা অবস্থান করেন। ভাতিকানের সংবাদ সংস্থা জানায়, দূতাবাসে রুশ রাষ্ট্রদূতকে নিজের উদ্বেগের কথা স্পষ্ট ভাষায় জানান পোপ ফ্রান্সিস। পাশাপাশি ইউক্রেনে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে পোপ মহোদয় উপবাস করবেন ২ মার্চ রোজ বুধবার, যেদিন থেকে তপস্যাকাল শুরু। পরেরদিন (২৬/০২) ইউক্রেনে চলমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ ও মর্মবেদনা প্রকাশ করেছেন পোপ ফ্রান্সিস। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভালোদিমির জেলেনস্কিকে ফোন করে তাঁর উদ্বেগের কথা জানান। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি পোপকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোপ মহোদয়কে একটি টুইট করেছেন। ইউক্রেনের শান্তি ও যুদ্ধবিরতি কামনা করায় পোপের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট। ইতালিতে রাশিয়ান দূতাবাসে যাবার সিদ্ধান্তটি সারারাত প্রার্থনার ফলে এসেছে। কেননা তিনি চাননি যেন ইউক্রেনে আর মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ে। পোপ ফ্রান্সিসের অভূতপূর্ব আচরণের মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ভাতিকান রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট মোকাবেলায় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে চায়।

মার্চ ১৯: ভাতিকান কুরিয়ার নতুন সংবিধান প্রকাশ

কাটবে কিছু না জানিয়ে ও সবাইকে অবাক করে দিয়ে পোপ ফ্রান্সিস সাধু যোসেফের পর্বদিনে রোমান কুরিয়ার জন্য নতুন সংবিধান প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৯ বছরের

ছবি: ইন্টারনেট

প্রস্তুতি কাজের পরে 'মঙ্গলবাণী ঘোষণা করা' শিরোনামে ৫৪ পৃষ্ঠার প্রৈরিতিক সংবিধানটি প্রকাশ করা হয়। এটি পূর্ববর্তী প্রৈরিতিক সংবিধান 'উত্তম পালক' এর স্থলাভিষিক্ত হবে যা ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে পোপ ২য় জন পল কর্তৃক ঘোষিত হয়েছিল। প্রৈরিতিক সংবিধানের বেশ কিছু বিষয়বস্তু ইতোমধ্যে অনেকেরই জানা; কেননা দলিলের উপর ভিত্তি করে পোপ মহোদয় কুরিয়ার পুর্নগঠনের কাজ শুরু করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ভাতিকান কুরিয়ার যোগাযোগ বিভাগ ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে, বা খ্রিস্টভক্ত, পরিবার ও জীবন বিভাগ ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে, বা সার্বিক মানব উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে পুর্নগঠিত হয়। পোপ ফ্রান্সিসের একটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত হলো যে, মঙ্গলসমাচার ঘোষণা বিষয়ক বিভাগটির প্রধান হিসেবে পুণ্যপিতাই থাকবেন। যার মধ্যদিয়ে এটি স্পষ্ট হচ্ছে যে, পোপ মহোদয় সম্পূর্ণ কুরিয়াতে ও বিশ্বে একটি মিশনারী স্পন্দন জাগাতে চান।

নতুন প্রৈরিতিক সংবিধান মঙ্গলবাণী ঘোষণাতে খ্রিস্টভক্তদের জন্য বেশি ক্ষেত্র রেখে এ ধারা প্রতিষ্ঠা করে যে, কুরিয়াতে যে সকল পুরোহিতেরা কাজ করবেন তা হবে ৫ বছরের জন্য; যা ১বার নবায়িত হতে পারে। এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ভাতিকানে ক্যারিয়ারবাদ বা ক্ষমতা সৃষ্টি করার প্রবণতা রোধ করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, নতুন প্রৈরিতিক সংবিধান ঘোষিত হবার ৬মাস পরেও ৫ বছরের এই সময়সীমা বিষয়ে কোন স্পষ্টতা আসেনি।

এপ্রিল -৩: মাল্টার সেন্ট পলের গ্রুটো থেকে অভিবাসীদের জন্য পোপ মহোদয়ের প্রার্থনা

২০২২ খ্রিস্টাব্দে পোপ মহোদয়ের ১ম বিদেশ সফর ছিল ভূমধ্যসাগরীয় ছোট দ্বীপ দেশ মাল্টাতে। পোপ ২য় জন পল (১৯৯০) ও পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের (২০১০) পদাঙ্ক অনুসরণ করে পোপ ফ্রান্সিসও সেই গুহা পরিদর্শনে যান যেখানে সাধু পল জাহাজডুবির পর আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি বর্তমানের অভিবাসীদের জন্য প্রার্থনা করেন। দক্ষিণ মাল্টার হাল-ফারে খ্রিস্টান উদ্বাস্তু কেন্দ্রে ২০০জন অভিবাসীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। নয় বছর আগে লাম্পেদুসায় তার যাত্রার সময় অভিবাসন সংকটের মুখে সকলকে 'সভ্যতার জাহাজডুবি' সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করেন।

মে ৩: পোপ ফ্রান্সিস মস্কোর অর্থডক্স চার্চ প্রধান কিরিলের সমালোচনা করেন এবং মস্কো পরিদর্শনে ইচ্ছা প্রকাশ করেন

'পুতিন থামবে না, আমি তার সাথে মস্কোতে দেখা করতে চাই' - এই শিরোনাম নিয়ে ইতালিয়ান দৈনিক পত্রিকা কোরিয়ের দেল্লা ছেড়াতে মে ৩ তারিখে সকলকে চমকিয়ে দেবার মতো পোপ মহোদয়ের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। এটি উল্লেখযোগ্য যে, সাক্ষাৎকারটি সরাসরি পোপ মহোদয়কে উদ্ধৃত করেনা কিন্তু একজন সাংবাদিক পোপ মহোদয়ের কথার সারাংশ তুলে ধরেন। ইতালিয়ান দৈনিকে তুলে ধরা হয়, প্রেসিডেন্ট ভালোদিমির পুতিন এখনও পর্যন্ত পোপ ফ্রান্সিসের মস্কো পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশের পরও কোন উত্তর না দেওয়াতে দুঃখ প্রকাশ করেন পোপ। তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের এই ভয়াবহ পৈশাচিক যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন করেন এবং অবাক হন ন্যাটোর প্রশ্নবোধক আচরণের কারণে ইউক্রেনের ওপর মস্কোর এই 'রাগের' বিষয়টি আসায়। স্বাভাবিকের

বিপরীত ধারাতে গিয়ে একটি মন্তব্য আসে যে, রাশিয়ান অর্থডক্স চার্চের প্রধান পাট্রিয়ার্ক কিরিলকে পুতিনের গোলামী না করতে সতর্ক করে দেন পোপ ফ্রান্সিস। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে রোম ও মস্কোর মধ্যে একটি ঐতিহাসিক সৌহার্দ্যের পর তারা কিউবাতে মিলিত হন। কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধ রাশিয়ান অর্থডক্স চার্চ ও কাথলিক চার্চের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ধরাচ্ছে। জেরুশালেম ও কাজাখস্তানে সাক্ষাৎ হবার যে প্রস্তাব এসেছে তাও সত্যিকারভাবে বাস্তবায়িত হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে।

মে ৫: পোপ ফ্রান্সিস ১ম বারের মতো হুইলচেয়ারে

৫ মে পোপ ফ্রান্সিস প্রথমবারের মতো হুইলচেয়ারে করে জনসম্মুখে বের হলেন। সাধু ৬ষ্ঠ পল হলঘরে সিস্টারদের সাথে সাক্ষাৎদানের সময় তিনি তা ব্যবহার করেন। ৮৫ বছর বয়সী পোপ ফ্রান্সিস কয়েক মাস ধরেই ডান হাঁটুতে স্ট্রেনড লিগামেন্টের সমস্যায় ভুগছেন। পোপ মহোদয় জানান, সম্প্রতি তিনি ব্যথা উপশম করার জন্য কিছু ইনজেকশন পেয়েছেন। তবে হাঁটতে ও দাঁড়াতে এখনো তাঁকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। পায়ে ব্যথার কারণে তাঁকে কিছু সফর বাতিল করতে হয়েছে এবং কিছু হুইলচেয়ারে বসেই সম্পন্ন করতে হচ্ছে।

মে ১৫: পোপ ফ্রান্সিস চার্লস দ্য ফুকোসহ আরো ৯জনকে সাধুশ্রেণীভূক্ত করেন

রোজ রবিবার (১৫/০৫) সাধু পিতরের চত্বরে সাধুশ্রেণীভূক্তকরণ উপলক্ষে উৎসর্গীকৃত খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ৪৫ হাজার খ্রিস্টবিশ্বাসীদেরকে উৎসাহিত করে পোপ মহোদয় বলেন, নতুন ঘোষিত সাধুসাধ্বীদের জন্য ঈশ্বরের যেমনি স্বপ্ন ছিল তেমনি আমাদের জীবনকে নিয়েও তাঁর স্বপ্ন রয়েছে। আনন্দের সাথে সে স্বপ্নকে স্বাগতম জানাতে এবং প্রতিদিনকার জীবনে সে স্বপ্ন অনুযায়ী জীবনযাপন করার আহ্বান করেন। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের পরে এই প্রথম সাধুশ্রেণীভূক্তকরণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

উপাসনার শুরুতেই পোপ মহোদয় নতুন ১০জন সাধুসাধ্বীর নাম ঘোষণা করেন। তারা হলেন- টিটাস ব্রাণ্ডস্মা, লাজারুস দেবাসাহায়াম, চেজার দি বোস, লুইজি মারীয়া পলাসছো, জুস্টিনো মারীয়া রোসেল্লিলো, চার্লস দ্য ফুকো, মারীয়া রিভেয়ের, মারীয়া ফ্রান্সেস্কা অব যিজাস রোবার্তো, মারীয়া অব যিজাস সান্টোকানালে ও মারীয়া ডমিনিকা মান্তোভানী। পোপ জানান, সাধু চার্লস দ্য ফুকো তাঁর অতি প্রিয় ও কাছের একজন ব্যক্তিত্ব।

জুলাই ২৫: কানাডার আদিবাসী লোকদের কাছে পোপ মহোদয়ের ক্ষমা যাচনা

হাঁটুতে তীব্র ব্যথা থাকা সত্ত্বেও পোপ ফ্রান্সিস তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সম্মান দেখিয়ে জুলাই মাসের শেষের দিকে কানাডেতে একটি ফলপ্রসূ সফর করতে প্রত্যাশা করেন। পোপের এই সফরের জন্য কানাডার আদিবাসীগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান রয়েছে। কানাডাবাসীদের সম্বোধন করে বলেন, কানাডার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনারা হয়তো জানেন আমি আপনাদের মাঝে আসছি বিশেষভাবে যিশুর নামে আদিবাসী ভাইবোনদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে আলিঙ্গণ করতে। কানাডা সফরের প্রাক্কালে পোপ মহোদয় তাঁর আসন্ন প্রৈরিতিক সফরকে দেখেছেন একটি অনুশোচনামূলক তীর্থযাত্রা হিসেবে। তিনি আশা করেন, এ তীর্থযাত্রা দেশের আদিবাসী ভাইবোনদের মধ্যে নিরাময় ও পুর্নমিলন স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তিনি ব্যাখ্যা করে বলছিলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ কানায় অনেক খ্রিস্টান ব্যক্তি বিশেষ করে কিছু ধর্মীয় সংঘের কোন কোন সদস্য সাংস্কৃতিক আত্তীকরণের নীতিতে অবদান রেখেছেন, যে আত্তীকরণ অতীতে আদিবাসী গোষ্ঠীসমূহকে বিভিন্ন উপায়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। পোপ মহোদয় এপ্রিল মাসে ভাতিকানে কানাডার ফার্স্ট নেশসন, ইনুইত এবং মেতিস জনগণের প্রতিনিধিদের সাথে একাধিক বৈঠকের কথা স্মরণ করেন। সে বৈঠকগুলোতে তিনি কানাডার আবাসিক স্কুলগুলোর জীবনপ্রণালীর গল্পগুলো শুনেছিলেন। শোনার পরে মনে হয়েছে আদিবাসী শিশুদের জোরপূর্বক কানাডার সংস্কৃতির সাথে একীকরণের একটি পরিকল্পনা। তা বাস্তবায়ন করতে শিশুদেরকে পরিবার ও গোষ্ঠী থেকে আলাদা করে কানাডিয়ান সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ বোর্ডিং স্কুলে রেখে পড়াশুনা করানো হতো। ঐ ঘটনাগুলোতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যে যন্ত্রণা পেয়েছেন পোপ মহোদয় তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তাদের কষ্টের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। আর এরই ফলশ্রুতিতে পোপ মহোদয় কানাডার প্রৈরিতিক সফরকে অনুশোচনামূলক তীর্থযাত্রা বলে অভিহিত করেছেন। "এখন আমি একটি অনুশোচনামূলক তীর্থযাত্রা করতে যাচ্ছি, আশা করি যা ঈশ্বরের কৃপায় কানাডায় নিরাময় ও পুনর্মিলনের যাত্রায় অবদান রাখতে পারবে।"

আগস্ট ২৭: পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক ২১ জন নতুন কার্ডিনালের নাম ঘোষণা ও কার্ডিনাল কলেজে অর্ন্তভূক্তিকরণ

২৯ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার স্বর্গের রাণী প্রার্থনা শেষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস জানান যে, আগামী ২৭ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তিনি নতুন কার্ডিনালদের প্রতিষ্ঠার জন্য কনসিসটরী ডাকছেন। পরবর্তী দু'দিন-সোম ও মঙ্গলবার (২৯-৩০ আগস্ট) তিনি সকল নতুন কার্ডিনালদের সাথে সাক্ষাৎ করে রোমান কুরিয়া পুর্নগঠন বিষয়ক তাঁর প্রৈরিতিক অনুশাসন 'মঙ্গলবাণী ঘোষণা কর' নিয়ে আলোচনা করেন। সারাবিশ্বের বিভিন্ন মহাদেশ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, বিভিন্ন পরিস্থিতি ও বিভিন্ন পালকীয় কর্মকাণ্ডে রত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিদেরকেই কার্ডিনাল হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে কার্ডিনাল কলেজে ২০৮জন রয়েছেন; যাদের মধ্যে ১১৭জন ভোটদাতা এবং ৯১জন বয়সের কারণে ভোটদাতা নন। আগস্টের ২৭ তারিখে কার্ডিনালদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হবে ২২৯ জন যাদের মধ্যে ১৩১জন ভোটদানে যোগ্য থাকবেন। বিশ্বের প্রায় সকল প্রান্ত থেকেই নতুন কার্ডিনালদের মনোনয়ন করা হয়েছে। ৮জন ইউরোপ থেকে, ৬জন এশিয়া থেকে, ২জন আফ্রিকা থেকে, ১জন উত্তর আমেরিকা থেকে এবং ৪জন সেন্ট্রাল ও লাতিন আমেরিকা থেকে।

সিনড ঘোষণার ১ বছর পর ভাতিকান মহাদেশীয় পর্যায়ে কার্যকরী নথি প্রকাশ করেছে। ৪৬ পৃষ্ঠার এই দলিলটিতে ১১৪টি বিশপ সম্মিলনীর ১১২টি সারাংশ তুলে ধরে মহাধর্মপ্রদেশীয় পর্যায়ে কাজের কাঠামো দান করছে। এই অভূতপূর্ব প্রক্রিয়াটি মণ্ডলীকে যাজককেন্দ্রিক না করে আরো বেশি মিশনারী, অংশগ্রহণকারী করে তুলবে। মণ্ডলীতে নারী ও যুবদের স্থান, পুরোহিতদের কষ্ট, উপাসনা নিয়ে বিতর্ক বা স্থানীয় মণ্ডলীর সংবেদনশীল অবস্থা, পুনঃবিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, বহুগামিতা, যৌন নির্যাতন ইত্যাদি কঠিন প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যায়নি; কিন্তু এখনো পর্যন্ত উত্তর দেয়নি। মহাধর্মপ্রদেশীয় সভা এই নথি বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে তাদের রিপোর্ট জমা দিতে বলেন যাতে করে রোমান পর্যায় অক্টোবর ২০২৩ এর মধ্যে চূড়ান্ত হতে পারে। অক্টোবর ২০২২ সভায় জানানো হয়, সিনড ২০২৪ পর্যন্ত চলমান থাকবে ।

নভেম্বর ৪: বাহরাইনে, পোপ মহোদয় আল-আযহারের গ্র্যাণ্ড ইমামের সাহসিকতাকে অভিনন্দন জানান

পোপ মহোদয় ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ৪র্থ বিদেশ সফরে বাহরাইনে যান। যেখানে তিনি পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যকার শান্তি ও সংলাপ ফোরামে অংশ নেন। এই সফরটি একটি বিশেষ সুযোগও বটে যেখানে তিনি তার 'ভাই' আল-তায়েবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। যার সাথে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে আবুধাবীতে 'মানব ভ্রাতৃত্ব' নামে এক ঐতিহাসিক দলিলে সাক্ষর করেছিলেন। সুন্নী রাজ্য বাহরাইনে অবস্থানকালে পোপ গ্র্যাণ্ড ইমাম আযহারকে ধন্যবাদ জানান শিয়া ভাইদেরকে সংলাপে আহ্বান করার জন্য। তিনি গ্র্যাণ্ড ইমামকে বলেন, আপনি খুবই সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন মুসলিম ভাইদেরকে নিজেদের মধ্যে সংলাপের আহ্বান জানিয়ে এবং মুসলিম বিশ্বে সংলাপের ফলপ্রসূতা দেখে আমি খুশি।

নভেম্বর ১৮: কুরিয়া ও জার্মান বিশপদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব

জার্মানীর কাথলিক মণ্ডলীতে সংস্কারবাদীদের স্পন্দন ইস্যুকে কেন্দ্র করে ভাতিকান রোমান কুরিয়া ও জার্মান বিশপদের মধ্যকার এক প্রাণবন্ত তর্কালোচনা প্রত্যক্ষ করে। এক বিশেষ সীমিত সভায় বিশপ বিষয়ক দপ্তরের প্রিফেক্ট কার্ডিনাল মার্স ক্যুয়েলেট যৌন নিপীড়নের ঘটনাগুলোতে সাড়াদানে জার্মান সিনোডাল পথের বিভিন্ন প্রস্তাবগুলো সামনে নিয়ে আসলে তা 'বিচ্ছেদের' ঝুঁকির মধ্যে পড়বে বলে মনে করা হয়। কানাডিয়ান কার্ডিনালের উদ্বেগগুলো, যথা- যাজকদের বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্য বাতিল করা, নারীদের যাজক অভিষেক, যৌন নৈতিকতার বা সমকামিতার ব্যাপারে মণ্ডলীর অবস্থান পরিবর্তন বিষয়গুলো বিবেচনার কথা আসলে তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়॥

তথ্যসূত্র : news.va

কাফরুল খ্রিস্টান সমিতি এর পক্ষ থেকে সকলকে জানাই শুভ বড়দিন ও নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

MERRY CHRISTMAS

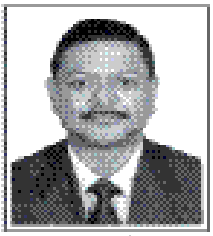

বর্তমান কার্যকরী পরিষদ

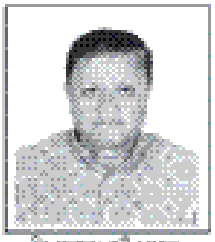

[illegible]
সভাপতি

[illegible]
সহ-সভাপতি

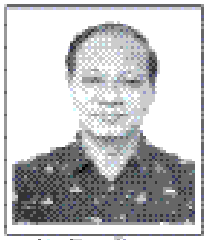

[illegible]
সহ-সভাপতি

[illegible]
সাধারণ সম্পাদক

[illegible]
সহ-সাধারণ সম্পাদক

[illegible]
কোষাধ্যক্ষ

[illegible]
নারী ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক

[illegible]
[illegible]

[illegible]
যুব বিষয়ক সম্পাদক

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

লক্ষীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শুভ বড়দিন ও নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।
খ্রিস্টীয় প্রেমে সবার জীবন হোক আনন্দময়।

লক্ষীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ব্যবস্থাপনা কমিটি (২০২১-২০২৪)

মি. দীপক আগষ্টিন পিউরীফিকেশন
চেয়ারম্যান

মি. সজল জেমস্ রোজারিও
ভাইস-চেয়ারম্যান

মি. রিপন জেমস কস্তা
সেক্রেটারী

মি. দোলন প্রাসিড গমেজ
ম্যানেজার

এড. মৃণাল কান্তি বাড়ৈ
ট্রেজারার

এড. রেবেকা পলিনা গমেজ
ডিরেক্টর

মি.রিন্টু থিওটোনিয়াস গমেজ
ডিরেক্টর

মি. মাইকেল অনিমেষ গমেজ
ডিরেক্টর

মি. সুমন গ্রেগরী গমেজ
ডিরেক্টর

মি. অপু বার্নাড গমেজ
ডিরেক্টর

মি. হিউবার্ট গমেজ
ডিরেক্টর

মি. সিলভেষ্টার পালমা
ডিরেক্টর

ক্রেডিট কমিটি

মি. সুমন লেনার্ড রোজারিও
চেয়ারম্যান

মি. চার্লস নিকোলাস গমেজ
সেক্রেটারী

মি. তুষার কস্তা
সদস্য

সুপার-ভাইজরী কমিটি

মি. প্রদীপ আগষ্টিন গমেজ
চেয়ারম্যান

মি. প্রদীপ খান
সেক্রেটারী

মি. আগষ্টিন বার্ণাড গমেজ
সদস্য

আসন্ন বড়দিন-২০২২ উপলক্ষে
‘সাপ্তাহিক প্রতিবেশী’-এর সকল পাঠক/পাঠিকাবৃন্দকে

বড়দিনের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই

কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট বিশ্বাস করে

মানুষের সার্বিক উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও
নারী পুরুষের সমতাভিত্তিক ক্ষমতায়ন একটি সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থার পূর্ব শর্ত।

আমরা সম্পূর্ণ আবাসিক ও সর্বাধুনিক ভেন্যুতে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করে থাকি। আমাদের সঙ্গে আছেন দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক, যারা সার্বক্ষণিক কারিতাস ও সমমনা প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা অর্জনে দীর্ঘ সময় ধরে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছে। আমাদের মেধাবী গবেষকদল অব্যাহতভাবে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বেইজ লাইন সার্ভে, প্রকল্প মূল্যায়ন, প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি, এ্যাকশন রিসার্চ, ইমপ্যাক্ট স্টাডিসহ যে কোনো সামাজিক গবেষণাসমূহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে আস্থা অর্জন করেছে।

পরিচালক ও কর্মীবৃন্দ

কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট

২ আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ০২২২২২২৯৬২৫, ইমেইল- cdi@caritascdi.org
www.caritascdi.org

অনন্তধামে যাত্রার প্রথম বছর

প্রয়াত সিলভেস্টার দেশাই
জন্ম: ২৫ নভেম্বর ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর
২৫ তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও
ঢাকা-১২১৫

"শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছো, সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছো"

আমার সাধ না মিটিল আশা না পুরাইল, তবু-সকলই ফুরাইয়া গেল। বাবা বলে ডাকার সাধ, বাবাকে নিয়ে একসাথে বেঁচে থাকার আশা সবই শেষ হয়ে গেল। সেই দিন, যে দিন আমার বাবা আমাকে ছেড়ে এই ধরণী থেকে চির কালের মত পিতা পরমেশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গধামে চলে গেলেন। আমার বাবা শুধু বাবাই ছিলেন না বরং মায়ের মত সারাটি জীবন আমাদের পিতৃস্নেহ ও মাতৃস্নেহ দিয়েছেন। বাবা তোমাকে কোন ভাবেই ভুলতে পারছি না। তোমার সেই নাম ধরে ডাকা, আমার দিকে নিরব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, তোমার ভালোবাসা, আদর ও ছোঁয়া আমি সারাক্ষণ অনুভব করছি।

বাবা তুমি শুধু আমার বাবা ছিলে না আমার বড় সন্তানও ছিলে তুমি। সন্তান মাকে ছেড়ে চলে গেলে যেমন কষ্ট হয় আমি ঠিক তেমনই কষ্ট পাচ্ছি তোমাকে হারিয়ে। তোমার স্মৃতি আমার সমস্ত মন জুড়ে, ঘর জুড়ে রয়েছে।

আমার বাবা সিলভেস্টার দেশাই গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৫:৫৫ মিনিটে আমার বাসায় মৃত্যুবরণ করেন। বাবার ইচ্ছা ছিল বাবার সবকিছু যেন আমার বাসাতে হয় এবং বাবা চেয়েছিলেন তার অবস্থা যখন খারাপ হয় সেই সময় যেন আমি বাবার সামনে থাকি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার বাবার এই ইচ্ছা পূরণ করার সুযোগ দেয়ার জন্য।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই তুমি আমাদের সকলের হাতে পবিত্র পানি পান করে, আমাদের প্রার্থনা শুনতে শুনতে, গির্জার সন্ধ্যা কালীন ঘন্টা শুনে, মৃত সংবাদ প্রার্থনা শেষে আমাদের ও পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়েছো। ওপারে থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
মেয়ে: জেনেভি দেশাই (শিল্পা)
মেয়ে-জামাই: পলাশ পেরেরা
নাতি: আকাশ গাব্রিয়েল পেরেরা ও অনিন্দ্য মাইকেল পেরেরা

শুভ বড়দিন ও নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।
A N I K
মেসার্স অনিক এন্টারপ্রাইজ
আমদানী রপ্তানী ও সরবরাহকারী
স্বত্বাধিকারী : পলাশ পেরেরা
৮ নং তেজকুনীপাড়া, বোয়াল্লা ভিলা
হলিক্রস কলেজ রোড, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন : 02-58153223, 01829849420 Email : pereirapalash@yahoo.com

বিবাহিত জীবনের ৫০ বছরের স্বর্ণালী সুবর্ণ জয়ন্তী

মিঃ জন ব্যাপ্টিস্ট রোজারিও এবং মিসেস করুনা হিল্ডা রোজারিও

জোয়ামিস্ত্রি বাড়ি, গ্রাম: নাগরী, নাগরী ধর্মপল্লী

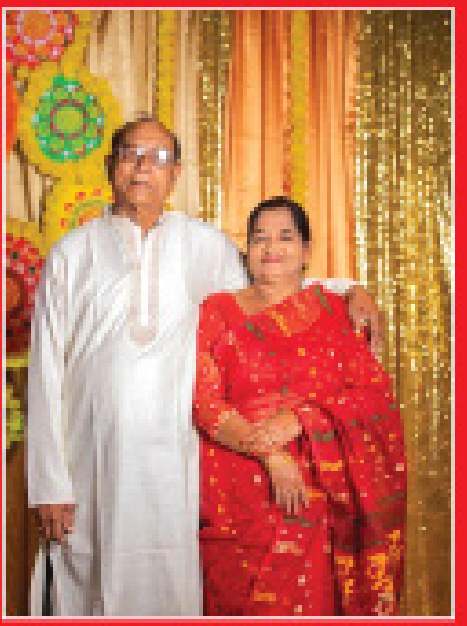

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি পবিত্র বিবাহ সাক্রামেন্তের মাধ্যমে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হন আমাদের প্রিয় বাবা-মা। বহু প্রতিকূলতা পেরিয়ে সুখ দুঃখে হাতে হাত মিলিয়ে আজ এই বিবাহিত জীবনে সফলতা ও আনন্দময় অধ্যায় পার করছেন। উত্তীর্ণ করেছেন বিবাহিত জীবনের সার্থকতার ৫০ বছর । সংসার জীবনের এই সফলতার জন্য পরম করুণাময় ঈশ্বরকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

মিঃ জন রোজারিও, নাগরী জোয়ামিস্ত্রি বাড়ির মৃত দানিয়েল এবং এমেলিয়া রোজারিওর জ্যেষ্ঠ পুত্র। মিসেস করুনা রোজারিও তামানিয়া গ্রামের প্রয়াত আন্থনী ও মনিকা রোজারিওর জ্যেষ্ঠ কন্যা।

সংসার জীবনের সাজানো বাগানে তারা ১ ছেলে এবং ৪ মেয়ের জনক-জননী। বর্তমানে স্বপরিবারে তারা সবাই আমেরিকাতে বসবাসরত। ৫০ বছর খুব সহজ হিসাব না, খুব কম মানুষই তাদের বিবাহিত জীবনকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারে। ঈশ্বরের অসীম কৃপা না থাকলে তা কখনোই সম্ভব হয় না। আমরা সন্তান হিসাবে এই নিয়ে গর্ববোধ করি। বাবা-মাকে এই সুন্দর সময়ে এক সাথে পেয়ে আমরা সত্যিই নিজেদেরকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করছি। প্রার্থনা করি তোমরা সুস্থ থাকো, ভালো থাকো আর আমাদের আশীর্বাদ করো যেন তোমাদের ভালোবাসা এবং জীবনাদর্শে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করতে পারি।

বড়দিনের এই শুভক্ষণে আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

বাবা-মা : জন এবং করুনা রোজারিও
ছেলে এবং ছেলের বউ : খোকন মাইকেল এবং ফ্রেসি রোজারিও
বড় মেয়ে এবং মেয়ের জামাই : রুমা এবং বাবলু গমেজ
মেজো মেয়ে এবং মেয়ের জামাই : ঝুমা এবং ডমিনিক রোজারিও
সেজো মেয়ে এবং মেয়ের জামাই : নীলিমা এবং চয়ন জেভিয়ার
ছোট মেয়ে এবং মেয়ের জামাই : রাখী রোজারিও এবং প্রেইস ডি'কস্তা
নাতি এবং নাতনী : রে, জে, ড্যান্নি, তন্ময়, ম্যাথিও, মে, মৃন্ময়
ইভেলিনা, কিয়না, ক্যারেন এবং জেমি।

ম্যারিল্যান্ড, ইউএসএ

প্রয়াত মার্গারেট গমেজ
জন্ম: ১৩ জুলাই, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৭ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
ভুবা বাড়ি, তেজকুনীপাড়া
তেজগাঁও, ঢাকা।

**"সংসারের মায়া ছেড়ে আজিকে গেল যে জন
দাও প্রভু, দাও তারে অনন্ত জীবন।"**

গত ৭ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ দিবাগত রাত আটটায় মিসেস **মার্গারেট গমেজ (ভুবা)**, স্বামী প্রয়াত ডমিনিক গমেজ (ভুবা) ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল নব্বই বছর। বার্ধক্যজনিত কারণ তো ছিলই তাছাড়া ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত অবস্থায় দীর্ঘ ষোল বছর তিনি শয্যাশায়ী থেকে তিনি পরলোকগমন করেন। একমাত্র পুত্রবধূর নজীরবিহীন অক্লান্ত সেবা দ্বারা তিনি দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়েছিলেন। অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে ধর্মপল্লীর পুরোহিতগণ নিয়মিত তাকে সাক্রামেন্ত প্রদান করেছেন। সেসাথে স্থানীয় সেন্টাগ্রেস দল, ক্যারিজমেটিক প্রার্থনা দল, ভিনসেন্ট ডি'পল সোসাইটির সদস্যবৃন্দ, প্রতিবেশি ও আত্মীয়-স্বজন তার সাক্ষাতে এসে প্রার্থনা করেছেন। আমরা পরিবারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধেয় ফাদারগণ ও সকল প্রার্থনা সেবীদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন একমাত্র পুত্র, পুত্রবধূ, দুই মেয়ে আটজন নাতি-নাতনী, তিন নাত-বৌ ও দুই নাত-জামাই। আমাদের মায়ের অসুস্থকালীন সময় থেকে সমাধিদান পর্যন্ত যে যেভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, আমাদের সান্ত্বনা দিয়েছেন, প্রার্থনা করেছেন তাদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। সেই সাথে ফাদার [illegible]কে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ ও সমাধিদানের জন্য।

শোকাহত –
পুত্র : জন গমেজ
পুত্রবধূ : এভলিন রত্না গমেজ
বড় মেয়ে : এ্যান্টোনিয়া গমেজ
ছোট মেয়ে : হেলেন গমেজ ও
নাতি, নাতনী, নাত-বৌ ও নাত-জামাই।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র পরিবার থেকে সকলকে জানাই
পুণ্যময় বড়দিন এবং নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
Wishing You All Merry Christmas & Happy New Year

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু
পরিচালক ও সম্পাদক

হিসাব বিভাগ

জুলিয়ান ডি' রোজারিও
প্রধান হিসাব রক্ষক

অমিত রোজারিও
সহকারী হিসাব রক্ষক

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী প্রকাশনী

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র

জেরী প্রিন্টিং

JENNY CANADA

IMMIGRATION CONSULTANCY Ltd.

RCIC

No Fake Promises, No False Hopes,

We Firmly Focus on Realistic Deliveries!

জেনী গমেজ একজন লাইসেন্স প্রাপ্ত কানাডিয়ান ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট (RCIC) এবং **Jenny Canada Immigration Consultancy Ltd.** এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কানাডার কলেজ অব ইমিগ্রেশন অ্যান্ড সিটিজেনশিপ কনসালটেন্টস (CICC) এর একজন মেম্বার।

Our Services:

- Express Entry
- PNP
- Study Permit
- Visitor Visa
- Business Programs
- Family Sponsorship
- Work Permit Process
- Super Visa
- Atlantic Immigration Program
- Rural and Northern Immigration Pilot
- Home Child Care Provider Pilot and Home Support Worker Pilot

Jenny Gomes
Regulated Canadian Immigration
Consultant (RCIC), R712605

আপনার কানাডা জার্নি নিয়ে পরামর্শ করতে RCIC **জেনী গমেজ** এর সাথে কনসালটেন্সি সেশন বুক করতে আজই যোগাযোগ করুণ।

বাংলাদেশে আমাদের প্রতিনিধি

আগষ্টিন বাড়ৈ

Call/WhatsApp: +88 01761768926
Email: info@jennycanadaimmigration.ca

কানাডা (কর্পোরেট অফিস):
15 Saddlestone Way NE
Calgary, Alberta, Canada

বাহরাইন অফিস:
506, Bldg: 743, Road: 831
Ola Tower, Sanabis, Bahrain.

প্রতারিত হবেন না- এ ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চয়তা চাইলে আমাদের সার্ভিস ব্যবহার করার অনুরোধ থাকবে। মানুষকে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত প্রতারণার হাত থেকে মুক্তি দেয়াই আমাদের কোম্পানি প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ

Website: www.jennycanadaimmigration.ca

আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে
বিশ্বে শান্তির রাজকুমারের জন্মোৎসব।
সোনার বাংলায় কিশোরের কীর্তন
কিশোরীর সবায় আর শীতের মিষ্টান্ন॥

তুমি নামে যীশু মনে শিশু
অন্তরে অমৃত বাণী
এবার তোমায় চিনেছি ভাই॥

সবাইকে পুণ্যময় বড়দিন এবং নববর্ষের শুভেচ্ছা।

মায়া আনজুস গোমেজ
পিটার কর্নেলিয়াস গোমেজ।

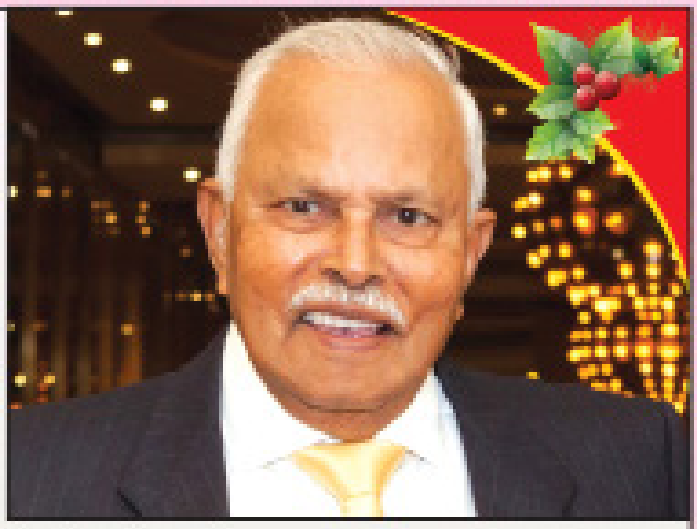

Our beloved Papa, Dominic Botlero

Dearest Papa,
We think about you always,
we talk about you still.
You haven't been forgotten,
And you never ever will.
We hold your smile and memories in our hearts,
and there you will remain.
To walk and guide us through our lives,
until we meet again.

Merry Christmas and Happy New Year! *We hope this Christmas and New Year bring you all lots of happiness, love, peace, and prosperity. May you and your family be gifted with countless blessings and it's people like you that make Christmas a sacred and meaningful occasion.*

On behalf of BOTLERO family,
Dr. Roslin Botlero
Melbourne, Australia.

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100 Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100 Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Web: www.wklypratibeshi.org